দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা।।
২৮ জুলাই - ২০১৪।।
১১ শ্রাবণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

পঞ্চশীল চীনের নীতি না মুখোশ ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

শিল্পক্ষেত্রে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের সার্বিক ক্ষতি করছেন □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : ছোট ঘটনাকে বড় দেখবেন না দিদিকে একদম ডিস্টার্ব নয় □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

নতুন সরকারের কাছে পুরনো চ্যালেঞ্জ— মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ১২

পঞ্চশীলের হীরক জয়ন্তী : আগ্রাসী চীনের দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজির প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে □ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃপ্রাঃ) □ ১৪

পঞ্চশীল চুক্তি চীনের মুখোশ □ শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল □ ১৭

দিশাহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা □ বাণীব্রত মিত্র □ ২০

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন - নৃসিংহ অবতার □ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার □ ২১

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত যিনি মাতান ঝঙ্কারে □ চতুর্থ পাণ্ডব □ ২৩

দুই রাষ্ট্র, দুই মিত্র □ সৌরভ জ্যোতি শর্মা □ ২৭

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের অসাধ্য সাধন : কীটনাশকের অভিশাপ থেকে মুক্তির দিশা □ ২৯

সাক্ষাৎকার : নূরজাহান নিয়াঝ □ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদর্শ নারী-বিদ্বেষী মোল্লাদের অশনি সঙ্কেত □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ অন্যরকম : ৩৩ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮ □ খেলার জগৎ : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১১ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ২৮ জুলাই - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৮

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
৪ আগস্ট
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ আগস্ট
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রক্ষাবন্ধন ও জাতীয় সংহতি

আমাদের দেশে বারোমাসে তের পার্বণ হলেও এমন কিছু উৎসব আছে যার শুধু ধর্মীয় মূল্য নয়, সামাজিক এবং জাতীয় মূল্যও আছে। রাখি পূর্ণিমা বা রক্ষাবন্ধন এমনই একটা উৎসব যা জাতীয় সংহতিকে পুষ্ট করে। এই নিয়েই এবারের বিশেষ আকর্ষণ— রক্ষাবন্ধন ও জাতীয় সংহতি। লিখেছেন অতুল কুমার বিশ্বাস, ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ও নবকুমার ভট্টাচার্য।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিপন্ন রাজ্যের শিল্প-কারখানা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লগ্নি টানিতে সিঙ্গাপুর যাইতেছেন। মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর তাঁহার প্রথম বিদেশ সফর। রাজ্যের শিল্প দপ্তর বলিতেছে, আমাদের মতো পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আনিতে সিঙ্গাপুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুর যাইলে ফিনানসিয়াল হাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির বিনিয়োগের সম্ভাবনা আরও বাড়িবে। পর্যটন ক্ষেত্রেও লাভ মিলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের আর্থিক উন্নয়নে যখন বিদেশি বিনিয়োগের কথা বলিতেছেন তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াস মহৎ। ইহার পরেও নরেন্দ্র মোদী বিদেশি বিনিয়োগের কথা বলিলে দেশ বিক্রি করিবার অভিযোগ কেন? বিদেশি বিনিয়োগ আনিলে পশ্চিমবঙ্গ যদি বিক্রি না হইয়া থাকে তাহা হইলে এমন অভিযোগ হাস্যকর। ২০০৬ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও ইন্দোনেশিয়া সফরে গিয়াছিলেন। সেই সফরে সালিম গোষ্ঠীর সহিত চুক্তি এবং সেই চুক্তি লইয়া পরবর্তী ঘটনাবলী উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুরের সহিত এই রাজ্যের বিনিয়োগ সম্পর্কের নজির রহিয়াছে। অন্ডাল বিমান বন্দরের অন্যতম বিনিয়োগকারী চাঙ্গি এয়ারপোর্ট গ্রামবাংলায় পা রাখিয়াছিল বাম জমানায়। আজ মুখ্যমন্ত্রী যখন শিল্প বিনিয়োগের জন্য সিঙ্গাপুর যাইতেছেন তখন রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতির চিত্র কিরূপ তাহা সকলেই অবগত। শ্রমিক ইউনিয়নের জঙ্গি আন্দোলনের ফলে বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় ব্রাত্য করিয়া দিয়াছিলেন দেশের শিল্পপতিরা। আজও কিন্তু সেই ট্র্যাডিশনের পরিবর্তন হয় নাই। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে তৃণমূলের শ্রমিক নেতাদের দাদাগিরি চালু হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে রাজ্যের পরিবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানাতেই জেসপ, ডানলপ, হিন্দমোটরস, নোকিয়া, সিমেন্স ইত্যাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রম দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারেই গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হইয়াছে মোট ৫১টি কারখানা, ২২টি চটকল, ২৬টি চা-বাগান। কর্মহীন হইয়াছে ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ মানুষ। সম্প্রতি শালিমার পেইন্টসের মতো ঐতিহ্যসমৃদ্ধ রঙ কারখানা রাজ্য হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ রাজ্যের বিবর্ণ শিল্পচিত্রের অবস্থাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শিল্পের খোঁজে বিদেশে যাইলেও রাজ্যের শিল্পের মুমূর্ষু অবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টা নীরব কেন? এই প্রসঙ্গে তাঁহার মন্তব্য— শিল্পায়ন লইয়া একতরফা কুৎসা চলিতেছে। অর্থাৎ অন্য বিষয়ের মতোই সিপিএম এবং বিরোধীদের ভূত দেখিতেছেন তিনি। আসানসোলের বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় তাই যথার্থই পরামর্শ দিয়াছেন, সিঙ্গাপুর যাইতে হইবে না, পূর্বে রাজ্যের শিল্পের যে দশা তাহার সমাধান করুন। তাহার পর সিঙ্গাপুর যান। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের এই রাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। জামুরিয়ার শ্যামসেলের ঘটনা সমগ্র বিশ্ব জানিল। ইহার পরও কেউ এখানে শিল্প গড়িতে আসিবে? মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করিয়াছেন, পরিকল্পনা করিয়াই তোলাবাজির সহিত তৃণমূলের নাম যোগ করা হইতেছে। সত্যই কি তাহাই? রাজ্যের মানুষ দেখিতেছেন তৃণমূলের ছোট বড় মেজ মাঝারি নেতারা কীভাবে শিল্প মালিকদের হইতে তোলা তুলিতেছেন। সারদা হইতে কীভাবে তোলা তুলিয়াছিল তৃণমূল তাহাও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মুম্বাইয়ে মুকেশ আম্বানী-সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিদের সহিত বৈঠক করিয়া আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু শিল্পের জন্য গুজরাটের যে তৎপরতা রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের সেই তৎপরতা কোথায়? নরেন্দ্র মোদীর সহিত অন্যদিগের তফাত এইখানেই। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি পাল্টাইয়া শিল্পের উপযোগী করিয়া তুলিবার দায়িত্ব কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। সেই কাজে এখনও তিনি অসফল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা দেশে যখন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তখন একটির পর একটি কারখানার দরজা বন্ধ হইতেছে। হতাশ শিল্প ও বণিক মহলের বড় অংশই।

সুভাষিত

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।

ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, চুরি না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয় সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্যবাদিতা এবং ক্রোধ না করা— এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সভা কি বিজেপি-মুখী ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : শান্তিনিকেতন॥ নজিরবিহীন ঘটনা শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সভা এবার ঘটা করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করল। শান্তিনিকেতনে এহেন ঘটনা প্রথম ঘটায় শুরু হয়েছে এই নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা। অধ্যাপক সভা এই ঘটনাকে রবীন্দ্র ঐতিহ্য রক্ষার পরম্পরা বলায় শান্তিনিকেতনে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন উঠেছে অধ্যাপক সভা কি বিজেপি-মুখী? বিশ্বভারতীর কর্মীসভাও সন্দেহের আঁচ করছেন।

গত ৬ জুলাই রবিবার সকালে শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটিতে ঘটা করে পালিত হলো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। উদ্যোক্তা বিশ্বভারতীর অধ্যাপকসভা। রীতিমতো সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ফুলমালায় বরণ করা হয় শ্যামাপ্রসাদকে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রায় ৮০-৮৫ জন অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী। সভায় বক্তৃতা দেন একাধিক অধ্যাপক। এই ঘটনার পর বিশ্বভারতী জুড়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় জন্মলগ্ন থেকে যে অধ্যাপকদের সংগঠন কংগ্রেস অনুগামী ছিল, তারা হঠাৎ কেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনে উদ্যোগী হলো? তাহলে 'বিশ্বভারতী অধ্যাপক সভা' কি এবার বিজেপি-মুখী? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সভার সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে অধ্যাপক সভা। তিনি বলেছেন, বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়। এখানকার আদর্শ স্বতন্ত্র, কবির চিন্তা স্বরূপ, বিশ্বভারতীকে সেই নিজস্বতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু বড় দুঃখের কথা, বিশ্বভারতী এখন আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হয়ে যাচ্ছে। তাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা বলেছিলেন তা বাস্তবায়িত করার দাবি নিয়েই এই সম্মেলন। আমরা তাঁর চিন্তাধারাকে সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এদিন অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংসদে প্রদত্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বভারতী সম্বন্ধীয় ভাষণের ফোটোকপি বিলি করা হয়।

বিশ্বভারতীর বহু অধ্যাপকই এই অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এঁদেরই অন্যতম অধ্যাপক সমিত রায় বলেন, অধ্যাপক সভায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করার। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী অ্যাক্ট তৈরি হয়, তাতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট ভূমিকা ছিল। একই সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেকুলারিজিম-এর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। তবে অধ্যাপক সভা কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। এই সভা এক সময় বামেরা ও কংগ্রেস নেতারা নেতৃত্ব দিয়েছে। এখন বিজেপি লোকজন সক্রিয় ভূমিকা নিতে চাইলে স্বাগত জানানো হবে।

বারাসাত এলাকায় গণ্ডগোলের আশঙ্কা

সংবাদদাতা॥ সম্প্রতি উত্তর ২৪-পরগণার বামনগাছিতে সৌরভ চৌধুরীর যে নৃশংস হত্যার ঘটনা ঘটে, তা একটি পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক ঘটনা বলে অভিযোগ উঠেছে। সৌরভ চৌধুরী এবং তার পরিবারের লোকেরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সঙ্ঘ-পরিবারের সদস্য হওয়াই এই হত্যার মূল কারণ বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক বৎসর ধরে বামনগাছিতে মুসলমান অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে। এর পেছনে মদত রয়েছে বামনগাছির কয়েকজন মুসলমান তৃণমূল নেতা। হানিফ মণ্ডল, ফকির মণ্ডল, সাহাবুদ্দিন, বাকিবুল্লার নাম উঠে এসেছে।

এরা প্রত্যেকে জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে যুক্ত এবং এদের পরিবার ভারত ও বাংলাদেশ দুইটি দেশেই আছে। কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় ৩০০ মুসলমান পরিবারকে এরা রেলের জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে এবং এদের বেশির ভাগকেই ভারতীয় রেশনকার্ড ও ভোটার কার্ড পাইয়ে দিয়েছে। এদের সহযোগিতায় এই অঞ্চলের জলসাতে 'অখণ্ড মুসলিম বাংলা' ও ভারত বিরোধী প্রচার পুরোদমে চলছে এবং এরাই সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে অসামাজিক ও ভারত-বিরোধী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় যুবকরা তাদের এসব কাজের বিরোধিতা করার জন্য বহুবার ধমকি ও আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে। কয়েকবার সংঘর্ষও হয়েছে। সৌরভের হত্যা এইসব প্রতিবাদী যুবকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও তাদের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বলে এলাকার মানুষ জানিয়েছেন। এই হানিক মণ্ডলরা ছোটোখাটো দুষ্কৃতীদের দিয়ে প্রতিবাদী যুবকদের ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু সৌরভ হত্যার পর তাদের সামনের পর্দা সরে গেছে। তাই গত ১৫ জুলাই হানিফের ভাগ্নে আমজেদ কিছু দুষ্কৃতীকে নিয়ে আর এক প্রতিবাদী যুবক শ্রীকান্ত ভদ্রকে বাড়িতে ঢুকে মারধর করে। এর ফলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।

এইভাবে প্রত্যেকটি প্রতিবাদী মুখকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছে। এর ফলে বামনগাছি ও বারাসাত সন্নিহিত এলাকায় একটি বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে বড় গণ্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে।

দাঙ্গামুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমমনোভাবাপন্ন সংগঠন 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আয়োজিত দিল্লীর এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ইন্দ্রেশকুমার মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি দাঙ্গামুক্ত ভারত গড়ার অনুরোধ জানালেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের সব সম্প্রদায়কে মাদক দ্রব্যের আসক্তি বর্জন করারও আহ্বান জানান। ইন্দ্রেশকুমার সঙ্ঘের একজন কার্যকর্তা। প্রসঙ্গত মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সহ-আহ্বায়ক ইমরান চৌধুরীর বয়ান অনুযায়ী ইন্দ্রেশজী তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে জোর দেওয়ার কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি উভয় ধর্মের মানুষকেই ভারতের মতো শান্তিপ্রিয় দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য দায়বদ্ধ থাকার প্রতিও জোর দেন। অনুষ্ঠানে সংস্থার সহ-আহ্বায়ক ইমরান বলেন, "আমরা ভারতকে নেশামুক্ত ও দাঙ্গামুক্ত দেশ নির্মাণ করতে চাইছি। এজন্য হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই এগিয়ে আসতে হবে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত দিল্লী রাজ্য সংখ্যালঘু শাখার সভাপতি আতিফ রশিদ আর এস এসের তরফে দেওয়া আহ্বানটিকে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও সহজবোধ্য বলেই বর্ণনা করেন। ইন্দ্রেশকুমারকে উদ্ধৃত করে রশিদ বলেন, দেশের সংহতি সুদৃঢ় করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এস এসের আদর্শই হলো এদেশকে সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলা। এই মহতী প্রচেষ্টায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই একইভাবে যোগদান একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রেশকুমারের বক্তব্যের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেন, যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হতে পারেন তাহলে মুসলমানরা কেন পারবে না। এই মর্মে দেশের নীতিতে সকলে সমান, তাই ভেদাভেদহীন তুল্যমূল্য সুযোগের অধিকারী হতে কোনো বাধা নেই। প্রসঙ্গত 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামতকে সংহত করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রয়াত সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছিল।

ইন্দ্রেশকুমার

চাঁচলে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের মূর্তি চুরি

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ মালদা শহর ও বিভিন্ন গ্রামের মন্দির থেকে অলঙ্কার ও মূর্তি চুরির ঘটনা সম্প্রতি বেড়ে গেছে। গত ১২ জুলাই শনিবার মালদার চাঁচল ২নং ব্লকের আলাদিপুর গ্রামের মন্দির থেকে রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি চুরি হলে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গৌরহণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা রবিবার সকালে গোবিন্দ এবং শিবমন্দিরের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়। মন্দির কমিটির সদস্য জগন্নাথ সরকার বলেন, আমরা ভিতরে ঢুকে দেখি প্রণামী বাক্সের তালা ভাঙা ও শ্বেত পাথরের রাধাগোবিন্দ মূর্তিটিও উধাও হয়ে গেছে। চাঁচল থানার পুলিশ এসে পাশের পাটখেত থেকে রাধাগোবিন্দের ভাঙা মূর্তি উদ্ধার করে। মূর্তির সঙ্গে থাকা সোনা ও রূপার গহনা পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, দুষ্কৃতীরা যদি শুধু গহনা ও টাকা পয়সায় নিতে আসবে তাহলে মন্দিরের সামনে থাকা তুলসীবেদী, মন্দিরের অন্যান্য আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড করবে ও মূর্তিগুলি ভাঙবে কেন? মন্দিরকে অপবিত্র করে এবং বিগ্রহ বিনষ্ট করে দুষ্কৃতীরা হিন্দু সংস্কৃতির উপর আঘাত দিতেই এইভাবে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করেছে। মনে করা হচ্ছে, কোনো হিন্দু দুষ্কৃতী এই ভাবে তুলসীবেদীকে এবং মূর্তিগুলিকে ভাঙবে না। গ্রামবাসীরা বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে সুন্দর এই মূর্তিগুলি রাজস্থান থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমন দুঃখজনক এবং ন্যক্কারজনক ঘটনা চাঁচলের আলাদিপুর গ্রামের মানুষদের বিমর্ষ করে তুলেছে। অনেকের মুখে বলতে শোনা যাচ্ছে, যদি আরও বেশি তালা দিতে পারা যেত কিংবা প্রহরার ব্যবস্থা করা যেত তবে এই রকম বিপর্যয় ঘটত না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং তল্লাসী চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে কিনা তা নিয়ে গ্রামবাসীদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আবার ওই দিনই মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের মোথাবাড়ি বাজারে ছানা বিক্রেতাদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের বচসা এবং তারপর হাতাহাতি হলে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে 'ধারে' ছানা না দেওয়ার জন্য গোপাল ঘোষকে দুষ্কৃতীরা মারধর করে। এর প্রতিবাদে গত ১৩ জুলাই মোথাবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতি বাজার বন্ধ রাখে। এর মধ্যেই আবার মুসলমানরা দলবদ্ধ ভাবে ছানা বিক্রেতাদের ওপর চড়াও হয় এবং তারিণী সাহা ও শুকদেব কুণ্ডুকে মারধর করে। তারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ, গত এক বছর আগে শিবরাত্রির মেলার সময়ে এই স্থানেই মুসলমানরা গণ্ডগোল বাধিয়ে ছিল। পুলিশ ও র‍্যাফ টহল দিলেও দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার না হওয়াতে স্থানীয় হিন্দুরা ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং প্রশাসনের ইচ্ছাকৃত ভাবে দুষ্কৃতীদের আড়াল করার অভিযোগ এনেছে। পুলিশের বক্তব্য, দুই পক্ষের লোকেই আহত হয়েছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।

ব্রহ্মপুত্রে ভারতের দীর্ঘতম সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর তৈরি হতে চলেছে ৪.৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এক সেতু, যা অসম এবং অরুণাচলপ্রদেশের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অসমের বগিবিল থেকে এই দ্বিতল সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, যা তৈরি করতে খরচ হবে ৫ হাজার কোটি টাকা। এই সেতু নির্মাণের ফলে চীনের বর্ডার যেতে ১০ ঘণ্টা সময় কম লাগবে।

২০০২ সালে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এই সেতুর শিলান্যাস করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় এলে সেতু নির্মাণের কাজ চলে যায় অথৈ জলে। আবার ২০১৪-তে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার ফলে যুদ্ধ গতিতে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সেতু তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে সি.ও.ও. এইচ. সি. সি.-র সভাপতি অরুণ করমবেলকর জানান, আমরা ২০১৬-এর মধ্যে কাজ শেষ করব বলে মনে করছি।

মূলত এই সেতু নির্মাণের কাজে দু'টি সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে চলেছে। ডি. এস. ডি. নামে এক জার্মান সংস্থা এবং ব্যাঙ্গালোরের ভি. এন. আর. সংস্থা। ৪.৯৪ কিলোমিটার এই

সেতুটিতে রেল চলাচলের পাশাপাশি চলতে দেখা যাবে বাস, ট্যাক্সিকেও। এই রেল-সহ যান চলাচলে সক্ষম সেতুর যোজনা উত্তর-পূর্ব রেলের এক বড় প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও যেখানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক মোট খরচের ৭৫ শতাংশ ব্যয় করবে সেখানে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সেতু নির্মাণের কাজে হাতই পড়েনি। অবশেষে কাজ শুরু হয়েছে।

দ্বি-স্তরীয় সেতু হিসাবে গড়ে উঠছে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু। যেখানে তিনটি লেনে রাস্তা এবং উপর দিয়ে দু-জোড়া ট্রেন লাইন পাতা হবে।

এছাড়াও সেতুটি ৩৯টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, যেগুলির এক একটি চওড়া ১২৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৩২.৭৫ মিটার। এই দ্বিতল সেতু নির্মাণে ৭০ হাজার স্টিল প্রয়োজন যা দিয়ে ১০টি আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়ে যাবে। ■

ট্রেন এখন থামবে না 'এমপি স্টপস'-এ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত বেশকিছু বছর ধরে ভারতীয় রেল লোকসানের মধ্যে দিয়ে চলছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ দীর্ঘদিন ধরে রেলের ভাড়া প্রকৃত অর্থে না বাড়া। সেই সঙ্গে আরও একটি তথ্য এবার প্রকাশ্যে উঠে এল। কিছু অপ্রয়োজনীয় স্টেশনে ট্রেন থামার ফলে আয়ের থেকে ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি। আর সেই পরিষেবা বন্ধ করতেই এবার তৎপর হলো সদানন্দ গৌড়ার রেল দপ্তর।

রেলের হিসাবে, ১,২৫০টি অপ্রয়োজনীয় স্টেশনে ট্রেন থামানোর ফলে প্রতিদিন রেলের ১ কোটি টাকা খরচ হয়। যার মধ্যে প্রতিটি স্টেশনে দৈনিক ৮ হাজার টাকা জ্বালানী খরচ হয়ে থাকে। আর সেই স্টেশন থেকে আয় বলতে মাত্র ৫০০ টাকা। এর ফলে বছরে মোট ক্ষতির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩০০ কোটি টাকায়। রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সমস্ত স্টেশনগুলিকে 'নীরব হত্যাকারী' বা 'সাইলেন্ট কিলারস' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন এতদিন ধরে এই স্টেশনগুলিতে ট্রেন থামানো হয়? এর উত্তরে রেলের এক আধিকারিক জানান, সাধারণত এলাকার এম পি বা সাংসদের কাছে জনসাধারণ ট্রেন থামানোর আর্জি জানায়। সাংসদও সেই মতো রেলের কাছে আবেদন জানায়। সেই থেকেই এই সমস্ত স্টেশনে ট্রেন থামতে থাকে। অর্থাৎ 'এমপি স্টপস'।

বিহার ও কেরলের মধ্যে এইরকম অপ্রয়োজনীয় স্টেশনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মোট ২,৪০০টি স্টেশনের মধ্যে ১,২৫০টি স্টেশন অপ্রয়োজনীয় এবং ট্রেন চালানো সাধ্যের বাইরে। আবার এরকমও দেখা গেছে, যে সাংসদ ট্রেন থামানোর জন্য আবেদন করেছিলেন রেলের কাছে, সেই সাংসদই আবার যখন সেখানে নির্বাচিত হতে ব্যর্থ তখন তিনিই আবার টিকিট বিক্রি না থাকলে ট্রেন থামানোর প্রয়োজন নেই বলে রেলের পক্ষে সওয়াল করেন।

রেলের দিক থেকে জোনাল অফিসিয়াল ম্যানেজারদের স্টেশনের আয় ব্যয়-এর হাল হকিকত বিবেচনা করে দেখার জন্য বলা হয়েছে। আবার এমন কিছু স্টেশনও আছে যেগুলি সামাজিক ভাবে প্রয়োজন আছে, সেইসব স্টেশনের বিষয়টিও দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে রেল সূত্রে। ■

দেশীয় শিল্পকে চাঙ্গা করতে অভিনব উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশের উন্নয়নে নির্মাণ শিল্পকে গুরুত্ব দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এতে একদিকে রয়েছে জাতীয় শিল্পকে চাঙ্গা করার চেষ্টা, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে একটি শিক্ষণীয় শিল্পনীতি। কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন এবং সড়ক ও জাহাজ পরিবহন মন্ত্রক সিমেন্ট শিল্পের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে স্থির করেছে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দের পরিকাঠামো প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ ছাড় দেওয়ানোর চেষ্টা হবে। এর মধ্যে সড়ক নির্মাণ ও বন্দর গঠনের প্রকল্পও থাকছে। আর এধরনের প্রকল্প রূপায়িত করতে গেলে দেশীয় সিমেন্টের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বাড়বে বুঝেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি সরকারের মনোভাব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অনেক বেশি দামী ও আমদানি করা বিটুমিনের পরিবর্তে রাস্তা নির্মাণে দেশীয় সিমেন্ট ব্যবহার করে এই শিল্পকে চাঙ্গা করা হবে। মন্ত্রক সূত্রে খবর, এ নিয়ে কোনো রাজনীতি যে কেন্দ্র বরদাস্ত করবে না সে বার্তাও দেওয়া হয়েছে সিমেন্ট শিল্পমহলকে। গড়করি স্পষ্টই দেশের বৃহৎ সিমেন্ট উৎপাদন সংস্থাগুলিকে নতুন কোনো বণিক সঙ্ঘ গড়ে তুলতে নিষেধ করেছেন। একই সঙ্গে উৎপাদন সীমাবদ্ধ ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করলে সিমেন্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি প্রতিযোগিতা বিরোধী চুক্তির মধ্যে দিয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হলে যে সরকার চুপ করে বসে থাকবে না সে আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে গড়করির বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, শুধুমাত্র উপসত্ত্বভোগীদের জন্যই এ ধরনের বণিক-সঙ্ঘ গড়ে তোলার বিরোধিতা সরকার করছে না। সরকার মনে করে এর ফলে দেশের উন্নয়নে বিশাল ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। যেহেতু নির্মাণ শিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো সিমেন্ট শিল্প। সবমিলিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও সিমেন্ট শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিটুমিন দিয়ে যে রাস্তা তৈরি হয় তার পরিবর্তে সিমেন্টের তৈরি রাস্তাতে খরচ অন্তত চার শতাংশ কম হবে বলে মন্ত্রক-সূত্রের খবর। এ নিয়ে ভাববার জন্য দেশের চারটি বৃহৎ সিমেন্ট শিল্প সংস্থাকে বলা হয়েছে বলে মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে। এও জানা গিয়েছে যে ওই কোম্পানিগুলিকে ভদ্রস্থ দর জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই দর দেখে তারপর কোম্পানিগুলিকে বিপুল পরিমাণ বরাত দেওয়া হবে। ফলে তাদের অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশে ছাড়ের কথাও বলতে পারবে সরকার। নতুন সরকার মনে করে, তাদের নির্মাণ শিল্পনীতিতে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৩০ কিলোমিটার সড়ক নির্মিত হচ্ছেই। জমি সংক্রান্ত যাবতীয় গণ্ডগোল অতি দ্রুত মিটিয়ে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার মতো নির্মাণ প্রকল্পের কাজও শুরু করে দেওয়া যাবে বলে সরকার আশাবাদী। এনডিএ সরকার ১৬টি নতুন বন্দর গঠনের পরিকল্পনা নেওয়ার পাশাপাশি তুতিকোরিন বন্দরের মতো পুরনো বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্যও বাজেট বরাদ্দ করেছে। সব মিলিয়ে সিমেন্টের বিপুল চাহিদার কথা ভেবে এই দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করতে চাইছে সরকার। সরকারের পরিকল্পনা রাস্তা নির্মাণ, বন্দর তৈরির মতো শিল্প দেশের সামগ্রিক জিডিপি যা বর্তমানে ৪.৫ শতাংশ তার থেকে অন্তত ২ শতাংশ বাড়াতে সাহায্য করবে। ■

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল শহর দিল্লী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্বের দ্বিতীয় জনবসতিপূর্ণ শহর হিসাবে উঠে এল দিল্লীর নাম। প্রথম স্থানে রয়েছে জাপানের রাজধানী টোকিও। তবে ১৯৯০-এর থেকে বর্তমান জনসংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দিল্লীর জনসংখ্যা ২৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ২০১৪ বিশ্ব নগরায়ণ সম্ভাবনা রিপোর্টেও একথাও উঠে এসেছে যে ২০৫০-এ ভারতের জনসংখ্যা সর্বাধিক হবে। চীনের পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যাবে ভারতকে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০-এ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভারতের রাজধানীর জনসংখ্যা এক লাফে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৬ মিলিয়নে অর্থাৎ ৩ কোটি ৬৭ লক্ষে। ২০১৪-তেই টোকিও বিশ্বের প্রথম জনবসতিপূর্ণ শহর হিসাবে উঠে এসেছে, যার সংখ্যা ৩৮ মিলিয়ন। মুম্বই ২০১৪-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ষষ্ঠ স্থানে। ২০৩০-এ যা চতুর্থ স্থানে এসে দাঁড়াবে। তখন মুম্বই-এর জনসংখ্যা ২১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ২৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ২ কোটি ৮ লক্ষ। সাংহাইতে ২৩ মিলিয়ন, মেক্সিকো সিটি, মুম্বই এবং সাওপাওলো ২১ মিলিয়নের মধ্যে জনসংখ্যা থাকবে বলে ২০১৪-এর জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টে উঠে এসেছে। রিপোর্টে এটাও উঠে এসেছে ২০১৪ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে ভারত, চীন, নাইজেরিয়া-সহ তিন দেশের শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ৩৭ শতাংশ বাড়বে। তবে ২০৩০-এ ভারতের তিন শহর কলকাতা, পুনে এবং সুরাট এক বৃহৎ মেগাসিটি হিসাবে উঠে আসবে। যাদের জনসংখ্যা প্রায় ২৭ মিলিয়নে দাঁড়াবে। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি ভারতের আঞ্চলিক (গ্রামীণ) শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে ভারতের গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা ৮৫৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ৮৫ কোটি ৭০ লক্ষ। সেখানে চীনে রয়েছে ৬৩৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা। এক্ষেত্রে ভারতের বেশ কিছুটা পিছনে রয়েছে চীন। ■

জনসংখ্যা ভিত্তিক স্থান	শহর	জনসংখ্যা
প্রথম	টোকিও	৩৮ মিলিয়ন
দ্বিতীয়	দিল্লী	২৫ মিলিয়ন
তৃতীয়	সাংহাই	২৩ মিলিয়ন
ষষ্ঠ	মুম্বই	২১ মিলিয়ন

শহাঞ্চলের সর্বাধিক উন্নতি ঘটবে ২০১৪ থেকে ২০৫০-এর মধ্যে। যার মধ্যে ভারত, চীন, নাইজেরিয়া এই তিন দেশ থাকবে।

ভারতের শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ৪১০ মিলিয়ন (৪১ কোটি) থেকে ২০৫০-এ বেড়ে দাঁড়াবে ৮১৪ (৮১ কোটি ৪০ লক্ষ) মিলিয়ন।

জাতিসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী

শিল্পক্ষেত্রে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তৃণমূলনেত্রী রাজ্যের সার্বিক ক্ষতি করছেন

পশ্চিমবঙ্গের সত্যান্বেষী দিদিভাই মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং শহরে বসেই জানতে পেরেছেন যে বর্ধমানের জামুড়িয়ায় শ্যাম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের কারখানা তাঁর দলের 'সমাজসেবী' কর্মীরা শিল্প সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলেছিলেন। দলের সমাজসেবীদের অনুরোধ ছিল স্থানীয় কিছু বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া। সংবাদমাধ্যম সেটাকেই তোলাবাজি এবং অফিসারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অসত্য প্রচার করছে। অথচ এই শিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে জামুড়িয়া থানায় যে অভিযোগ করা হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে দুইজন যুব তৃণমূল নেতার নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তারা একদল দুষ্কৃতী নিয়ে তাঁদের কারখানা থেকে তোলা আদায় করতে এসেছিল। তোলা দিতে অস্বীকার করায় কারখানার কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। বছর তিনেক আগে দু' হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে শ্যাম গোষ্ঠী ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু করেছিল। তখনই ঘোষণা করা হয় যে তাঁরা তিন পর্যায়ে নয় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু গত ১৬ জুলাইয়ে তৃণমূলের যুব সমাজসেবীদের তাণ্ডবে সেই বিনিয়োগ এখন অন্য রাজ্যে করবেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা জামুড়িয়ার কারখানায় উৎপাদন ৫০ শতাংশ হ্রাস করেছেন। এই শিল্পসংস্থার কারখানা আছে অসম, মেঘালয় ও ওড়িশাতে। মোট কর্মী সংখ্যা ১৫ হাজার। বর্ধমানের জামুড়িয়ার কারখানায় কাজ করেন তিন হাজার কর্মী। তৃণমূলের যুব-সমাজসেবীদের সৌজন্যে কারখানা অন্য রাজ্যে (পড়ুন ওড়িশা) সরিয়ে নিলে এই তিন হাজার কর্মীরা তাঁদের পরিবার-সহ পথে বসবেন। যেমন পথে বসেছেন হাওড়ার শালিমার পেন্টস, নোকিয়া— সিমেন্স, হিন্দ মোটর, ডানলপের কর্মীরা এবং তাঁদের পরিবার। গত তিন বছরে তৃণমূলের সমাজসেবীদের দৌরাত্ম্যে বন্ধ হয়েছে ৫১টি শিল্প কারখানা, ২২টি চটকল, ২৬টি চা বাগান। কর্মহীন হয়েছেন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কর্মী। এরপরেও সত্যান্বেষী দিদিভাই বলছেন এ' সবই সামান্য ঘটনা। মিডিয়ার কুৎসা প্রচার। নবান্নে সাংবাদিকদের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা বহাল করা হয়েছে। রাজ্যের দিদিভাইয়ের এখন দুই শত্রু— বিজেপি এবং মিডিয়া। ২১ জুলাই দিদিভাইয়ের বাৎসরিক শহীদ দিবস উৎসবের জমায়েতে তিনি এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

গূঢ়পুরুষের কলম

সিপিএম নয়, কংগ্রেস নয়, তাঁর প্রধান শত্রু এখন বিজেপি। জেলায় জেলায় বিজেপি-র বিপুল প্রভাব বৃদ্ধিতে দিদিভাই ভীত।

অথচ কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গঠিত এনডিএ সরকারকে বন্ধু হিসেবে পেলে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তর লাভ হোত। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত পাঁচ দেশের ব্রিকস গোষ্ঠীর পরিচালিত 'নিউ ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রথম ছ'বছর সভাপতিত্ব করবে নরেন্দ্র মোদীর ভারত। এই ব্যাঙ্কের দুটি পৃথক তহবিলের থেকে খরচ করা হবে মোট ২০ হাজার কোটি ডলার। এই পাঁচটি দেশের শিল্প পরিকাঠামো গড়তে উন্নয়ন ফান্ড থেকে অর্থ ঋণ দেওয়া হবে সহজ শর্তে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা দেওয়া হবে। আর এই তহবিল পরিচালিত হবে মোদীজীর নির্দেশে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নব ভারত নির্মাণের। তিনি সর্বসম্মতভাবে ব্রিক্‌সের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। এতে ভারত লাভবান হবে। ভারতকে বিশ্বব্যাঙ্কের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে না। আমেরিকার দাদাগিরি খর্ব হবে। ব্রিকসের ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা সবচেয়ে বেশি পাবে ভারত ও ব্রাজিল। কারণ, চীন, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় শিল্প পরিকাঠামোর ঘাটতি ভারত এবং ব্রাজিল বেশ পিছিয়ে আছে। বিজেপিকে শত্রু ঘোষণা করে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের মানুষের সার্বিক ক্ষতি করছেন। রাজনৈতিকভাবে বিহারের নীতীশকুমার, ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক অথবা অসমের তরুণ গগৈই বিজেপি-র প্রতিপক্ষ। কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে তাঁরা রাজনৈতিক বিরোধিতাকে সামনে আনেন না। কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা তাঁদের রাজ্যের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা আদায় করে নিচ্ছেন। দলের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতো মূর্খতার পথে হাঁটছেন না।

গত ১৬ জুলাই বীরভূমের বোলপুরের ডাকবাংলো মাঠে বিজিপি-র জনসভায় ভিড়ের নিরিখে ১০-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে মাত্র ৬ দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাকে। ক্ষিপ্ত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নির্বিচারে মারধর করেছে সভা ফেরত বিজেপিকর্মী সমর্থকদের। একটা কথা মানতে হবে যে তৃণমূলের সমাজসেবীদের দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ বিজেপি-তে ভরসা খুঁজছেন। তৃণমূলকে এবার বাংলা ছাড়া করার সময় এসেছে। মরা গাঙে বান এসেছে এখন 'জয় মোদীজী' বলে নৌকার রশি খুলে দিন। মোদীজীর ভাবনায় নতুন স্বপ্ন দেখুন। তিনি নবভারত নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। আসুন আমরা তৃণমূলমুক্ত নবীন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে হাত লাগাই। মানুষ যদি ঘুরে দাঁড়ায় তখন সন্ত্রাস ছড়িয়ে লাভ হয় না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাস ছড়িয়ে সিপিএম জনজোয়ার রুখতে পারেনি। উল্টে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সঙ্ঘবদ্ধ মানুষকে ভয় দেখাতে পারে এমন শক্তিমান তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নয়। রাজ্যের আসন্ন পুরসভার ভোট এবং পরে বিধানসভার ভোটে বাংলার মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাংলার মানুষেরও একটা দায় দায়িত্ব আছে রাজ্যকে সার্বিক সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার। কথাটা ভুললে চলবে না। ■

ছোট ঘটনাকে বড় দেখবেন না দিদিকে একদম ডিস্টার্ব নয়

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ছোট জিনিসকে বড় করে দেখানোর যন্ত্রের নাম অনুবীক্ষণ যন্ত্র। আবার আতশ কাঁচও ব্যবহার করা যায়। এখানেই শেষ নয়, আজকাল বাংলার সংবাদমাধ্যমও সেই একই কাজ করে থাকে। না, সবাই নয়। দিদি আপনার বশংবদ মিডিয়াই শুধু সত্যকে সত্য বলে মনে করে।

শুরুটা যে কোথা থেকে করব ভেবে পাচ্ছি না। গোড়া থেকেই করা যাক। প্রথমেই রায়গঞ্জে অধ্যক্ষ নিগ্রহের ঘটনা ধরা যাক। একটি ছাত্র হতে পারে সে, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রশাখার নেতা তবুও তো সে ছাত্র। সেই কলেজে পড়া ছোট্ট ছাত্র একটু দুষ্টুমি করেই শিক্ষকমশাই মানে কলেজের প্রিন্সিপালের ওপর চড়াও হয়েছিল দলবল নিয়ে। দলবল বলতে গুণ্ডা মস্তান তো নয়, ওরই সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। সঙ্গে কয়েকজন বাইরের লোকও ছিল। কিন্তু কী এমন বড় ঘটনা! অথচ কটা দিন মিডিয়া কী না করল। আলোচনা, আলোচনায় ভরিয়ে তুলল টিভি, কাগজ। দিদি আপনি যখন বিষয়টাকে ছোট ঘটনা বলে ইগনোর করতে বললেন, তখনও চলল একই আলোচনা— ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার আলোচনা।

সেটা ছিল ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। এরপর ফেব্রুয়ারি মাসের এক শীতের রাতে পার্কস্ট্রিটে একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি হলো। অত রাতে ওই মেয়েটা ওই রাস্তায় কী করছিল সেটা কেউ প্রশ্ন করল না। কেউ জানতে চাইল না কেন, কী অপরাধে তার ওপর কতগুলো মদ্যপ ছেলেমানুষ চড়াও হলো। কেউ জানতে এল না ওই মহিলাও মদ্যপ ছিল কী ছিল না। কিন্তু তুফান তুলল প্রতিবাদের। একটা ছোট্ট ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে বড় বড় আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সেবারও আপনি বিষয়টাকে সাজানো ছোট ঘটনা বলার পরও কারও টনক নড়েনি। আসলে ছোট ঘটনা আর বড় ঘটনার মধ্যে ফারাক খোঁজার ইচ্ছা বা চেতনাটাই নেই এইসব বিরোধী মিডিয়াওয়ালাদের।

ওই মাসেই কাটোয়ায় ধর্ষণ হলো। পরে কামদুনিতে হলো। রাজ্যের এখানে সেখানে প্রায় প্রতিদিনই তো ছোটোখাটো ধর্ষণ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ধর্ষণ হয়ে চলেছে। অথচ মিডিয়ার বক্তব্য, সবকটা ধর্ষণই নাকি বড় বড় ব্যাপার। আসলে দিদি, এসব মিডিয়ার লোকেদের কোনও জ্ঞানই নেই কোনো ধর্ষণ ছোট আর কোনো ধর্ষণ বড় সেসব বোঝার। সাংবাদিকতার সিলেবাসে এটা ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে-কোনো ধর্ষণ হলো বড় কিন্তু এ রাজ্যে কোনো মেয়ের সম্মানহানি অতটা বড় নয়। নিছকই ছোট।

আর সেই সূত্র ধরেই মনে রাখতে হবে তাপস পাল (মাল) যখন বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে বিরোধীদলের সমর্থক পরিবারের মেয়েদের ধর্ষণ করানোর কথা বলেন সেটা খুবই ছোট হুমকি। এমন তো কতই হয়। ধর্ষণ তো করেইনি। করলেও ছোট ঘটনাই হত। আর ধর্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ তো আরও ছোট ঘটনা। অথচ কৃষ্ণনগরের ছোট্ট সাংসদকে কতই না গাল দেওয়া হলো। যত সব ছোট আর সাজানো ঘটনাকে বড় করে দেখানোটাই মিডিয়া সম্প্রদায়ের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাপসের আগে আপনার আরও সব ভাইয়েরা মানে আরাবুল, অনুব্রত, মনিরুলরা ছোটখাট ভুল করেছে বা বলেছে বলে মিডিয়া নিন্দায় ফেটে পড়েছে। কোনো মানে হয়! আপনার নামে কুৎসা করতেই যত চেষ্টা। মিডিয়াবালারা মনে করে সংবাদমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কিন্তু আসলে একটি স্তম্ভের ওপরই দাঁড়িয়ে থাকে গণতন্ত্র। আর তার নাম সংখ্যা। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা সর্বত্র সংখ্যায় যে আপনারা সবার থেকে অনেক অনেক এগিয়ে সেটাই মাথায় থাকে না এই সব বিরোধী মিডিয়ার। এমনকী স্কুল কমিটি দখলের লড়াইতেও যে আপনারা সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন সেটাই ব্যাটাদের মাথায় থাকে না। কে কীভাবে সেই ক্ষমতা দখল করল সেটা বড় কথা নয়। শাস্ত্রেই বলেছে, প্রেমে আর রণে নীতি রাখতেই নেই। গায়ের জোরেই হোক আর স্কিলের জোরেই হোক জেতাটাই আসল কথা। ফলই আসল উত্তর। এই যে বিশ্বকাপ কোন দেশ কত ভালো খেলেছে তার বিচারে জয় পরাজয় বিচার হয় না। সেটা হয় কোন দেশ ঠিকঠাক গোলে বল ঢোকাতে পারল। তবে সেখানে হ্যান্ডবল, ফাউল, অফসাইড করা যায় না। কিন্তু রাজনীতিতে রেফারি, লাইন্সম্যানদের নিজের দলে টেনে নেওয়া যায়। আর সেটা করতে পারলেই নো হ্যান্ডবল, ফাউল, অফসাইড। তার জোরেই তো আজ আপনারা এত ক্ষমতাশীল। আর এমন বড় ক্ষমতা দখল করলে কিছু ছোট ছোট ঘটনা ঘটবেই। সে সবকে করতে হয় 'ছোট ঘটনা' তকমা দিয়েই।

সুতরাং, দিকে দিকে যত গোলমাল, যত খুন-ধর্ষণ, যত সিন্ডিকেট অশান্তি, শিল্পপতিদের কাছে তোলাবাজি এসবকে ছোট ঘটনা হিসেবেই দেখা উচিত। একটি 'বড়' ক্ষমতাশালী দল যখন এসব কাজে যুক্ত থাকে তখন বৃহত্তর স্বার্থে ইগনোর করা উচিত, সহ্য করা উচিত। এটা বাংলাকে শিখতে হবে। বাঙালিকে শিখতে হবে। যদি না পারেন তবে কানে তুলো গুজে, চোখে ঠুলি বেঁধে রাখুন। দিদিকে ডিস্টার্ব করবেন না।

— সুন্দর মৌলিক

নতুন সরকারের কাছে পুরনো চ্যালেঞ্জ—মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, বলুনতো এমন কী একটা সমস্যা যা আমজনতা প্রায় প্রতিদিন স্মরণ করে থাকে? আপনি হয়তো বেশি না ভেবে জবাব দেবেন— 'বাজারে আগুন'। সংসারে সকলের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাতে হবে তো! কীভাবেই বা এই সমস্যার সমাধান করব? এর উত্তর আমারও জানা নেই। সত্যি করে বলতে, এই সমস্যা মেটানোর ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। এটা দেশের সরকারকেই মেটাতে হবে।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। জনগণ মূলত তিনটি বিষয় মাথায় রেখে ভোট দিয়েছেন— মূল্যবৃদ্ধি কমানো, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান। বিগত দু'টি ইউপিএ সরকারের জিনিসের দাম কমাতে ব্যর্থতা, শিল্প ও কর্মসংস্থান তৈরিতে অপদার্থতা এবং অন্যদিকে উন্নয়নের মন্ত্রকে হাতিয়ার করে আজ নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। গদিতে বসে সরকার প্রথমেই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে এবং রাজ্যগুলিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম ঠেকাতে আগাম সতর্কতা নিতে বলেছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সরকার কীরকম উদ্বিগ্ন। কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাময়িক বেড়ে গেলে, তা না কিনলেও মানুষের চলে যায়। এর তালিকায় যেমন আছে নিত্যব্যবহার্য সুগন্ধী তেল, সাবান, প্রসাধনী, ভোগ্যপণ্য, তেমনি আছে ভালো মাছ, মাংস, দামি সব্জি ইত্যাদি। কিন্তু আলু, চাল, পেঁয়াজ এগুলি জিনিসের দাম বাড়লে খাদ্যতালিকা থেকে তা সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখার উপায় বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। কেননা এগুলিই যে গরিবের একমাত্র খাবার। অথচ দেখুন, খুচরো বাজারের দাম বৃদ্ধি দশ শতাংশের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে, আর খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রায় বারো শতাংশ। ফলে মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়েছে, আর গরিবের পেটে টান। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি গণতন্ত্রে একটি সরকারকে পর্যন্ত উল্টে দিতে পারে। অতীতে সুষমা স্বরাজের নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের পতন অথবা হালে দিল্লীতে শীলা দীক্ষিত বা রাজস্থানে অশোক গেহলটের সরকারের নির্বাচনে ভরাডুবি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আর সদ্যসমাপ্ত একদশকের ইউপিএ সরকারের তো কথাই নেই। তাই নতুন সরকারের কাছে এটি পুরানো ব্যাধি।

যা হোক, অসুখের কারণগুলি জানা দরকার, নইলে সঠিক ওষুধ দেওয়া যাবে না। মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে এবং তা মোকাবিলা করার জন্য সরকারের হাতে কি কি হাতিয়ার আছে তার বিচার-বিশ্লেষণ কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থনীতির বিষয় যা এই প্রবন্ধের পরিসরে অপ্রাসঙ্গিক। বরং এখানে আমরা দেশে বেড়ে চলা বাজারদরের প্রকৃত কারণ জানার সঙ্গে সঙ্গে এর থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজবো।

অর্থনীতির ভাষায় মুদ্রাস্ফীতি হলো টাকার জোগান বাড়ার ফলে জিনিসের দাম বাড়া। অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশের বাজারে টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া ও বিশ্ব বাজারে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়া। অর্থনীতির একটি অমোঘ তত্ত্ব আছে যা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা হলো জোগানের তুলনায় চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে, আর জোগানের তুলনায় চাহিদা কমলে দাম কমবে। অনেক তত্ত্বের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির দু'টি তত্ত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এক, ক্রমবর্ধমান সরকারি খরচের কারণে টাকার জোগান বৃদ্ধি। দুই, উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমে যাওয়া। সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, সরকারের নীতি (আর্থিক ও ফিসক্যাল) ও দক্ষতার উপর মূল্যবৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। এযাবৎ আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলি সুদূরপ্রসারি, তাই এর চট্‌জলদি সমাধান প্রায় অসম্ভব।

স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময় দেশ কংগ্রেস বা তাদের জোট (ইউপিএ)-এর শাসনাধীনে রয়েছে। তাই দেশের এই কারণ পরিস্থিতির জন্য মুখ্যত তারাই দায়ী। অর্থনীতিবিদরা বলেন যে, লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি বেশি হয়, তবে জিনিসের দাম বাড়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, সেখানে মাথাপিছু আয়ও বাড়ে। আর আয় বৃদ্ধি মানে চাহিদাও বৃদ্ধি। নতুন শতকের শুরুর বছরগুলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু বিগত চার-পাঁচ বছরে আর্থিক বৃদ্ধি প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। তবু কেন এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি? অর্থনীতির পক্ষে এটা কিন্তু একটা অশনি সংকেত, কেননা এই রকম পরিস্থিতি প্রকারান্তরে সরকারি কোষাগারের বেহাল দশা আর সরকারের উপর বিপুল ঋণের বোঝাকেই নির্দেশ করে। দিনের পর দিন ভোটসর্বস্ব রাজনীতির কারণে সরকার সংস্কারের পথ থেকে সরে এসেছে। অসৎ ও অদক্ষ প্রশাসনের কারণে একদিকে প্রশাসনিক ব্যয় বেড়েছে, অন্যদিকে বিপুল রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। অপদার্থতাকে ঢাকতে গিয়ে সবক্ষেত্রে ঢালাও ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। সামাজিক প্রকল্পে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে যার সুফল খুব কমই গরিবের হাতে পৌঁছেছে। বাড়তি সরকারি খরচের বোঝা সামাল দিতে দেশ ও বিদেশ থেকে সরকারকে বিপুল ঋণ করতে হয়েছে। দেশ আজ খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেমনটি হয়েছিল উনিনব্বই-নব্বই

সালে আর্জেন্তিনার হাল।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কিন্তু এক নয়। বৃদ্ধি হলো সার্বিকভাবে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। অন্যদিকে উন্নয়ন হলো বৃদ্ধির সুফলকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়ানো। আর্থিক বৃদ্ধি যে দেশে হয়নি এমন হয়, কিন্তু উন্নয়নের প্রশ্নে দেশ পিছিয়ে পড়েছে। গরিবের ভালো করতে গিয়ে সামাজিক প্রকল্পগুলিতে বহু ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক অস্বচ্ছতার কারণে তার সুফল খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে পৌঁছয়নি। ফলে একশ্রেণীর মানুষ বড়লোক হয়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজার দর বেড়েছে। অন্যদিকে গরিবরা আরও গরিব হয়েছে, বাজারদর তাদের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। এর স্থায়ী সমাধানের রাস্তা যে ইউপিএ সরকারের জানা ছিল না তা নয়। কিন্তু বাস্তবায়ন করার না ছিল প্রচেষ্টা, না ছিল দক্ষতা। নতুন সরকার কিন্তু এসব বিষয় মাথায় রেখেছে। ক্ষমতায় এসে প্রথমেই সংস্কারের কঠিন পথ বেছে নিয়েছে। এতে স্বল্পকালে তাদের জনগণের বিরাগভাজন হতে হবে। চিরাচরিত পথে হেঁটে শুধু সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া যায়, কাজের কাজ কিছু হয় না। তাই সরকার তার নীতিতে স্থান দিয়েছে ধাপে ধাপে তেল, গ্যাস, ইত্যাদিতে ভরতুকি তুলে দেওয়া, প্রশাসনিক খরচের বাহুল্য বর্জন করা, ভরতুকি- নির্ভর সরকারি পরিষেবার আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া (যেমন, রেল পরিষেবা), উন্নয়নের অর্থে জনতাকে পাইয়ে দেবার বদলে পরিকাঠামো বাড়ানো ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, কালোবাজারি মজুতদারি প্রভৃতিকে কড়া হাতে দমন করা ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। এক কথায়, আর্থিক ও প্রশাসনিক স্তরে আমূল সংস্কার ছাড়া দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে নিস্তার নেই।

এবার আসা যাক অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের অস্বাভাবিক দাম বাড়ার বিষয়ে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে মজুত করে রাখা যায় এমন অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের (যেমন— চাল, আলু, পেঁয়াজ) দাম হঠাৎ করে ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। কম উৎপাদন, জোগানের ঘাটতি ইত্যাদি কিন্তু এর মূল কারণ নয়। গত বছর খুচরো বাজারে আলু দুর্মূল্য হলেও কিন্তু হিমঘরে প্রচুর আলু মজুত ছিল। কোনো কিছুর যখন দাম বাড়ছে, তার জোগান বাড়বে এবং চাহিদা কমবে। বাস্তবে কিন্তু এটাই একমাত্র নিয়ন্ত্রক শক্তি নয়। আড়তদার ও ফাটকাবাজেরা ভবিষ্যতে আরও বেশি লাভের আশায় সেই পণ্য মজুত করে রাখবে, তাই স্বল্পমেয়াদে তার দাম আরও বাড়বে এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা জোগানের ঘাটতির সুযোগে লাভ লুটবে। চাষিদের হাতে অর্থের অভাব এবং বাজারের দামের ব্যাপারে খবরা-খবর না থাকার কারণে ফড়েবাজ ও মজুতদারদের এত রমরমা। দীর্ঘমেয়াদে এ সমস্যার সমাধান খুঁজতে গেলে, খাদ্যপণ্যের বাজারে ফড়ে ও আড়তদারদের একচেটিয়া ক্ষমতা কমাতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার কতগুলি পদক্ষেপ নিতে পারে—

প্রথমত, সরকার ঘোষণা করতে পারে বাজারে কোনো একটি পণ্যের দাম কোনো একটি মাত্রা পেরোলেই মজুতদারদের কম দামে পণ্য বাজারে ছাড়তে বাধ্য করা হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রচলিত ব্যবস্থায় চাষিরা মাঠ থেকে ফসল তুলে তা হিমঘরে জমা রাখে যার বিনিময়ে 'বন্ড' নামে একটি রসিদ পায়। হিমঘর থেকে পণ্য বের করার সময় সেই বন্ড ফিরিয়ে দিয়ে এবং হিমঘরের ভাড়া চুকিয়ে পণ্য চলতি দামে বিক্রি করতে পারে। ঠিক সময়ে বেরোতে পারলে ভালো লাভ হয়। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে, কবে বাজার চড়বে আর কবে ভালো লাভ মিলবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকার মতো টাকার জোর ছোট চাষিদের থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই বন্ড তারা বেচতে বাধ্য হয় এবং কেনে ফড়েরা। তাই তাদের হাতে বাজারের দাম প্রভাবিত করার ক্ষমতা এসে যায়। এই বিনিময়টি ঘটে অলিখিত ভাবে, কারণ বাজারে সত্ত্ব বিক্রি করার আইন নেই। সরকারের প্রথম কর্তব্য, এই বিনিময়টিকে আইন করে দেওয়া আর একটা ন্যূনতম ক্রয়মূল্য বেঁধে দিয়ে এই বাজারে বন্ড কিনতে নামা। এতে দু'দিক থেকে লাভ।

একদিকে আলাদা পরিকাঠামো তৈরি না করে, হিমঘরেই পণ্য মজুত রেখেও সরকারের হাতে যথেষ্ট খাদ্যপণ্যের জোগান রাখতে পারা। অন্যদিকে যেহেতু মুনাফা লোটার জন্য সরকার বাজারে আসে না, তাই বাজারে ফড়েদের থেকে সরকার বেশি দামেই চাষিদের ফসল কিনতে পারে। তাতে চাষিদেরই লাভ। মোটের উপর সরকারের হাতে যথেষ্ট পণ্য মজুত থাকবে। মজুতদাররা তখন জানবেন, দাম চড়লেই সরকার স্বল্প দামে বাজারে পণ্য ছাড়তে থাকবে এবং বাজারদর ফের পড়ে যাবে। কাজেই ফাটকা খেলে দাম বাড়ানোর প্রবণতা কমবে। কখনও কোনো কারণে খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে গেলে সরকারের হাতে এখন দু'টি হাতিয়ার— আড়তদারদের কম দামে পণ্য বাজারে ছাড়তে বাধ্য করা, আবার নিজের হাতে থাকা পণ্য বাজারে ছেড়েও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা। একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের মতে, বাজারে জরুরি পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করলে সরকারের কর্তব্য গরিবের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। আয় বাড়লে চাহিদাও বাড়ে, ফলে দামও বাড়ে। অন্য রাজ্যের জোগানদারেরাও এ বাজারের দিকে আকৃষ্ট হবে। যে বাজারে স্থানীয় মজুতদারদের একচেটিয়া অধিকার ছিল, তা অনেকটা প্রতিযোগিতার বাজার হয়ে দাঁড়াবে যেখানে অস্বাভাবিক বেশি মূল্যস্তর টিকতে পারে না। ফলে দামও কমবে। তবে হ্যাঁ, ভিন রাজ্য থেকে যতদিন পণ্য বাজারে আসতে সময় লাগবে, সে সময়ের জন্য বাজারের জোগান বজায় রাখার দায়িত্ব সরকারের। আগে উল্লেখ করা দু'টি পন্থা অবলম্বন করে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তাছাড়া বিপণনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত চাষিদের সমবায়, চুক্তি চাষ ইত্যাদিও ভাবা যেতে পারে। এইসব পরিকল্পনা সার্থক করতে দু'টি জিনিস নিশ্চিত করতে হবে। এক, আধিকারিকরা যাঁরা সরকারের তরফে এইকাজগুলি করবেন তারা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ফাটকাবাজের মতো আচরণ যেন না করেন। দুই, বাজারনিয়ন্ত্রক এই ফড়ে বা মজুতদারদের টাকার জোরে সরকার যেন নীতি না বদলায়। নতুন সরকারের কাছে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন আশা করাটা বোধহয় আমাদের খুব একটা আবদার হবে বলে মনে হয় না। ■

পঞ্চশীলের হীরক জয়ন্তী : আগ্রাসী চীনের দীর্ঘ মেয়াদি স্ট্রাটেজির প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে চীনের রাজধানীতে মহাধুমধামে 'পঞ্চশীল চুক্তি'র হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হলো। এই চুক্তির ৬০ বৎসর পুর্তি হয়েছে। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেবার বার্মার উনুতে এই চুক্তির ঘোষণা করেন। পঞ্চশীল চুক্তির পাঁচটি সঙ্কল্প ছিল— রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা ও

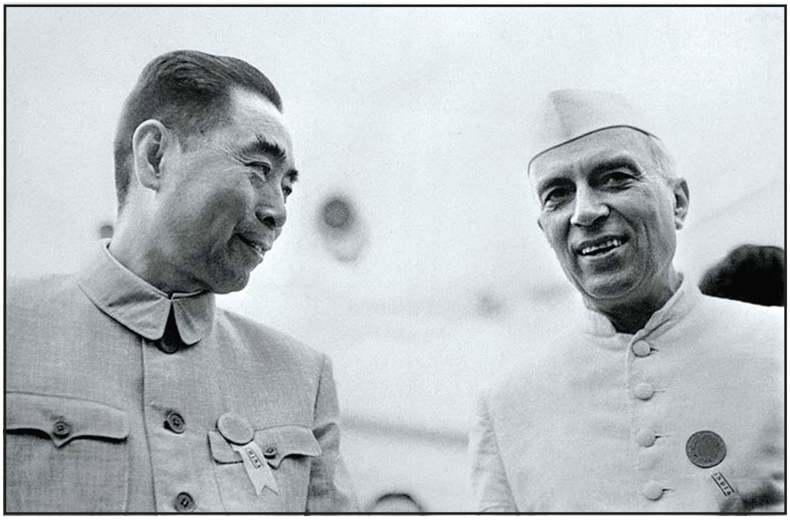

চৌ এন লাই এবং জওহরলাল নেহরু (১৯৫৪)।

সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা, অন্য রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসী মনোভাব বর্জন করা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা, সকল রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য সহযোগিতার হাতবাড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।'

কিন্তু বিগত যাট বছরে চীন এই পঞ্চশীলের কতটা মান্য করেছে, প্রথমেই এই হীরক জয়ন্তীতে বিচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রথমেই যে কাজটা তারা করেছে সেটা তিব্বতের উপর সামরিক অভিযান। তিব্বতের সঙ্গে চীনের কোনোরকম রক্তের সম্পর্ক কোনোদিনও ছিল না। আজও নেই। সংস্কৃতির কোনো বন্ধনও নেই। তিব্বত চীনের উপর আর্থিক দিক দিয়েও নির্ভরশীল ছিল না। কোনো এক প্রাচীন চুক্তির বলে চীন তিব্বতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। যেহেতু তিব্বত সরকার ধর্মগুরু দ্বারা পরিচালিত, চীন তিব্বতের উপর 'সুজারিনিটির' অধিকার পালন করত। হঠাৎ চীন তিব্বতের উপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে তিব্বত আক্রমণ করে বসে। হাজার হাজার লামা নিহত হন। দালাই লামা তাঁর কিছু সঙ্গী নিয়ে দুর্গম হিমালয় পার হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারত সরকার তাঁকে সাদরে আশ্রয় দেয় এবং অনুরোধ করে, ভারতে থেকে কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপ না করতে। কিন্তু এর জন্য চীন সরকার ভারতের উপর বিরূপ হয়। আজও সেই বিরূপতা রয়েছে।

চীনের দ্বিতীয় কাজ অরুণাচলে ভারত ভূখণ্ড চীনের ভূখণ্ড হিসাবে দাবি করা, আকসাই চীনের ভারত ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করে নেওয়া। এসবই চীন করেছে ভারতের প্রকৃত ভূখণ্ডের দোহাই দিয়ে। ম্যাকমোহন লাইন তারা মানে না, একথাও তারা জানিয়ে দিয়েছে। পঞ্চশীলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, ১৯৬২-তে তারা ভারত আক্রমণ করে তাদের দাবি অনুসারে অরুণাচল ও লাদাখে ভারত ভূখণ্ড অধিকার করার প্রয়াস করে। পরে অবশ্য তারা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ফিরে যায়। তারা বুঝেছিল, ওই ভূখণ্ড ধরে রাখার ক্ষমতা তখন তাদের ছিল না। আজও তারা তাদের দাবিতে অটল। হীরক জয়ন্তীর সময়েই তারা নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছে যেখানে সম্পূর্ণ অরুণাচল চীনের ভূখণ্ড হিসাবে দেখানো হয়েছে।

ভারত সরকার সেই পঞ্চশীলের দিন থেকে চীনকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এসেছে। সম্মান করে এসেছে চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতাকে। বিশ্বাস করেনি কম্যুনিস্ট চীন সেই সভ্যতা থেকে বিচ্যুত এক আগ্রাসী পার্টি দ্বারা পরিচালিত। কারণ ভারতের লোকসভায় এমন ভাষণও সে যুগে শুনতে পাওয়া গিয়েছে, সরকার পক্ষের মন্ত্রী বলছেন, ভারত অন্য কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রতি লোলুপ নয়, তাহলে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন কোথায়? তাঁরা জানতেন না, বিদেশী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি থেকে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড রক্ষা করার জন্যও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হওয়া প্রয়োজন। আজও সেই অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। যুদ্ধ কবে হবে তার ঠিক নেই, কিন্তু দু-টাকা দরে চাল বিতরণ করলে আগামী নির্বাচনে কুর্সি বাঁচানো সম্ভব হবে!!

শুধু তাই-ই নয়, অরুণাচল ও কাশ্মীর

বিবাদিত অঞ্চল বলে চীন কাউকে ভিসা দেবে না, কিন্তু অধিকৃত কাশ্মীর বিবাদিত হলেও সেখানে সৈন্য সমাবেশ করে কারাকোরাম হাইওয়ে নির্মাণ করতে তাদের দ্বিধা নেই। সর্বশেষ তারা দাবি করেছে, দক্ষিণ চীন সমুদ্র চীনের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র। জাপানের মেনকাকু দ্বীপ চীনের ভূখণ্ড, ভিয়েতনামের কোনো অধিকারই নেই দক্ষিণ চীন সমুদ্রে। কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্ম যেমন খনিজ অধিকার নেই তৈল উত্তোলন করার ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় চীন সগৌরবে পঞ্চশীলের হীরক জয়ন্তী পালন করলেও ভারত শুধুমাত্র দর্শক।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, চীনের চেয়ারম্যান জি জিংপিং কেন এত উৎসাহের সঙ্গে পঞ্চশীলের হীরক জয়ন্তী পালন করতে উৎসাহী?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া মহাদেশে একচ্ছত্রভাবে সুরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে শান্তিরক্ষায় ব্যস্ত রয়েছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানে— প্রায় সর্বত্র।

জি জিং পিং বলতে চাইছেন, শীতল যুদ্ধের সময়ের পরিস্থিতি আজ আর নেই, কিন্তু

হামিদ আনসারি এবং জি জিংপিং (২০১৪)

আজও সেই সময়ের ব্যবস্থাই চলে আসছে। এর আশু পরিবর্তনের প্রয়োজন। এশিয়ায় সমস্ত রাষ্ট্র একটা নতুন জোট গঠন দ্বারা নিজেদের সুরক্ষা ও কল্যাণের পথ নির্ধারণ করতে সক্ষম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখানে মাথা গলানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি ভারত ও মায়ানমারের প্রশংসা করে আরও বলেছেন, এই তিনটি এশিয়ার রাষ্ট্র এই মহাদেশের শান্তির বাণী সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব আজ ওই পথে শান্তি ও সহাবস্থানের লক্ষ্যে একতাবদ্ধ হচ্ছে। এশিয়া মহাদেশে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অন্য কোনো তৃতীয়পক্ষের যেমন বৃটেন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বাস্তব অন্য তথ্য দিচ্ছে। চীন অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় পিছনে ফেলে দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে এবং সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখন বিশ্বে দ্বিতীয়স্থানে। এমতাবস্থায় তার আগ্রাসী দাদাগিরির প্রভাবে জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনস ইত্যাদি রাষ্ট্র নিজেদের অসুরক্ষিত মনে করছে। তারা আরও গভীর ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস করছে। যদিও চীন সরকার বলে চলেছেন, তাদের উত্থান এবং শক্তির প্রকাশ এশিয়া মহাদেশে কোনো রাষ্ট্রের ভয়ের কারণ নেই। পঞ্চশীলের মতো চুক্তির মাধ্যমে ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রই নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছে। জাপান ইতিমধ্যেই নিজেদের সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায়

চিরায়ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত
আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (চারখণ্ডে) ১০০০
সংস্কৃত মূলপাঠ ও টীকাসহ সরল বঙ্গানুবাদে
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (চারখণ্ডে) ৮০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা ৩০০
মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত
সুশ্রুত সংহিতা (চারখণ্ডে) ৮০০
মহর্ষি শার্ঙ্গধর বিরচিত
শার্ঙ্গধর ঃ চিকিৎসা সংগ্রহ ১৭৫
শ্রীচক্রপাণি দত্ত বিরচিত চক্রদত্ত ২২০
শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ সোপান ১০০
মহামতি শ্রীমৎ মাধবকর বিরচিত নিদান ৩৫০
(রোগবিজ্ঞান, রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ও নাড়ীজ্ঞান রহস্য গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত)
শ্রীমৎ রাখাল দত্ত কবিরাজ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৭৫
মহর্ষি বাগভট অষ্টাঙ্গহৃদয় (দুইখণ্ডে) ৪০০
মহামুনি কণাদ বিরচিত
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৭৫
আচার্য ভাবমিশ্র বিরচিত
ভাবপ্রকাশ (চার খণ্ডে) ১২০০
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ২০০
মহর্ষি বাগভট বিরচিত
রসরত্নসমুচ্চয় (দুই খণ্ডে) ৬০০
(রসরহস্য বিজ্ঞানম ও পরিভাষা প্রদীপ গ্রন্থ দুইটি সংযোজিত)
অধ্যক্ষ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন কৃত
কায়চিকিৎসা ২৫০
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ বিরচিত
ভৈষজ্য রত্নাবলী (তিনখণ্ডে) ৭০০
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত ঃ দর্শন ও পদার্থসূত্র ২২৫
আয়ুর্ব্বেদ সংকলন ২২৫
(শারীরবিজ্ঞান, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস, সহজ রোগনির্ণয়)
সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণ
মহর্ষি চরক বিরচিত
চরক সংহিতা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০
সুত্রস্থান।। নিদানস্থান।। বিমানস্থান।।
চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪০০
শারীরস্থান।। ইন্দ্রিয়স্থান।। চিকিৎসিত স্থান।। (প্রথমাংশ)
চরক সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড) ৩৫০
চিকিৎসিত স্থান (শেষাংশ)।। সিদ্ধিস্থান।। কল্পস্থান।।
দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯
☎ ২২৪১-৪১৫০
E-mail : deepayan07@gmail.com

শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য নির্ভরশীল ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে নিজেদের সৈন্যঘাটী রেখেছে। তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে চেয়ারম্যান কমরেড জি জিং পিং আবার নতুন করে এশিয়া মহাদেশে পঞ্চশীল চুক্তির জোরদার নবীকরণ কেন করতে চাইছেন? বুঝতে হবে, চীনের প্রতিটি পদক্ষেপ দীর্ঘকালীন স্ট্রাটেজির উপর ভিত্তি করেই গ্রহণ করা হয়। চীনের ভূখণ্ডের বাইরে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে যাতে বিশ্বের অন্য কোনো শক্তির প্রভাব না থাকে সেটাই চীনের প্রধান লক্ষ্য। পঞ্চশীলের মতো আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে আবদ্ধ রেখে প্রবল প্রতাপ চীনের আগ্রাসী ট্যাকটিক্স কার্যান্বিত করার একটা কৌশল— এই হিসাবে পঞ্চশীলের নবীকরণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'। ভারত পঞ্চশীল আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু চীন পঞ্চশীলের প্রতিটি ধারাই 'হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই'-এর কলরোলে পদদলিত করেছে, ভারত ভূখণ্ড আক্রমণ পর্যন্ত করেছে। তিব্বতকে গিলে ফেলেছে, দালাই লামা প্রাণ বাঁচিয়ে ভারতে রয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে মায়ানমারের দুটি দ্বীপ ইজারা নিয়ে রেখেছে, ইরাবতী নদীর নাব্যতা বাড়াতে হাজার হাজার চীনা কারিগর সৈনিক কর্মরত বহু বছর যাবৎ। তারা মায়ানমারের সামরিক শাসন যন্ত্রের বিশেষ সুহৃদ।

যখন বেজিং-এ হীরক জয়ন্তীর উৎসব চলছিল, চীন নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে সম্পূর্ণ অরুণাচল এবং আকসাই চীন যে তাদের ভূখণ্ড তা সমস্ত বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে।

ভারত জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে অবস্থান করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক উপকরণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারতের চরম দুর্দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিমান, যুদ্ধজাহাজ ও অন্য অস্ত্র উপকরণ দিয়ে ভারতকে সহায়তা করেছিল। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় সুরক্ষায় একটিই মাত্র উপায় আছে, এমন প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করার জায়গা নেই। একমুখ হাসি নিয়ে পিঠে ছুরি মারায় এদের জুড়ি নেই। অতএব সুরক্ষার জন্য নিজেদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে দ্বিতীয়বার ভারত ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে, আক্রমণকারীকে তার অকল্পনীয় মূল্য দিতে হবে। ভারতের সামরিক বাহিনী ১৯৬২ আর হতে দেবে না। ভারতের নতুন সরকার কি সেই শক্তি যোগাতে সক্ষম হবে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রথমবার 'ব্রিক' (বি আর আই সি) সম্মেলনে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসেছেন। তিনি চীনের চেয়ারম্যানকে কি বার্তা দেবেন এবং চীনের রাষ্ট্রপ্রধানই বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কি আশ্বাস দেন— জানবার জন্য শুধুমাত্র ভারতবাসীই নয় সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে। আমি আশাবাদী, বিশ্বাস করি, ভারত সোজা কথাটা সোজাভাবেই চীনকে জানাবে। ■

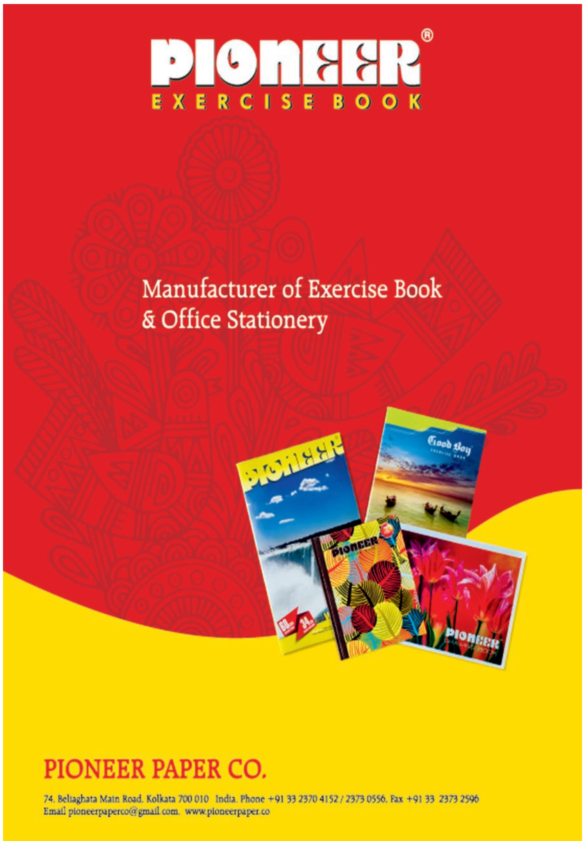

পঞ্চশীল চুক্তি চীনের মুখোশ

শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল

ভারত-চীন সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চশীল চুক্তির ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার অবসরে চীনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বেজিং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। এরকম সময়েও চীন তার পুরনো কুটিলতায় ফিরে গিয়ে ভারতীয় সীমানা নিয়ে বিরক্তি উৎপন্নের কাজ করে বসে। এবার চীন চুক্তির পবিত্রতা না বুঝে এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং পঞ্চশীল চুক্তির ষাটবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের দফারফা করে ছেড়েছে। চীন এক মাত্রচিত্র প্রকাশ করে অরুণাচলপ্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের একটা বড় অংশকেও নিজের বলে দাবি করেছে। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' চীনের এই বিতর্কিত মানচিত্র-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উদ্বেগের কথাও সমানভাবে প্রকাশ করেছে। এখানে এটাও উল্লেখনীয় যে, উপরাষ্ট্রপতির চীনযাত্রার সময়েই লাদাখে পেঙ্গোগ ঝিলে চীন-সেনার

বেজিং-এ চীনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন।

অনুপ্রবেশ ভারতীয় সেনারা রুখে দিয়েছে। এই নতুন ঘটনা কয়েক দশক ধরে চলে আসা চীনের সেই অভিযানেরই অঙ্গ যার দ্বারা তারা অরুণাচলপ্রদেশের ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং জম্মু-কাশ্মীরের অক্ষয় চিহ্নের ৩২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা নিজেদের বলে দাবি করে চলেছে।

গত এক দশক সময়ে যখন মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে 'নীতিপঙ্গু সংখ্যালঘু সরকার' চলছিল তখন চীনের এই কুৎসিৎ অভিযানের সংখ্যা বেড়েই গিয়েছিল। চমকে ওঠার মতো কিন্তু নির্মমসত্য যে, গত ছয় দশকের মধ্যে মনমোহন সরকারের নেতৃত্বের দশকে চীন সবচেয়ে বেশি ভারতীয় সীমা অতিক্রম করেছে এবং ভারতীয় সেনার মুখোমুখি হওয়ার অবস্থায় এসেছে। গত এক দশকেই ভারত-চীন সম্পর্কের রাজনৈতিক চর্চাও সর্বাধিক হয়েছে। এটা ঘোর আশ্চর্যের বিষয় যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মনমোহন সিংহ চীনের সঙ্গে এই এক দশকে পনেরবার রাজনৈতিক আলোচনা চালিয়েছিলেন। প্রত্যেক আলোচনার পরে ইউপিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রালয় একে সার্থক এবং ফলপ্রসূ বলে উল্লেখ করেছিল। বলা উচিত নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুর্বল বুঝেই চীন বিবাদ তৈরি করে আলোচনার টেবিলে ভারতকে বসিয়ে 'বলতে না দেওয়া'র খেলা চালিয়ে দখল করার অভিযান জারি রেখেছিল। কিন্তু এখন যখন ভারতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিশালী সরকার দেশ শাসন করছে তখন চীনের আবার সেই পুরনো খেলা শুরু করার দুঃসাহসের জবাব নরেন্দ্র মোদী সরকারের তাৎক্ষণিক দেওয়া উচিত।

যদি নরেন্দ্র মোদী সরকার এই সময় দেশের সীমানা ও চীনের দখলে যাওয়া কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের প্রতি সমবেদনা না দেখায় তাহলে চীন ২০১৪ সালেও গত দশ বছর ভারতের সঙ্গে যা করেছে তাই করতে থাকবে। ষড়যন্ত্র ও দখলদারি অভিযানের সঙ্গেই চীন দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের অভিযান চালিয়ে নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রভক্তি এবং হারানো ভূমির প্রতি প্রেম ও দায়বদ্ধতা খারিজ করে দেবে। গত দশ বছরের দুর্বল ইউপিএ সরকার চীনের প্রতি দুর্বল মানসিকতা দেখানোর কারণে বর্তমান এনডিএ সরকারের ঘাড়ে

অনেক দুশ্চিন্তার বোঝা জমেছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তর্জাতিক স্তরে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে এবং দেশের অভ্যন্তরে আত্মবিশ্বাসী বাতাবরণ উৎপন্ন করতে হবে। গত এক দশক ধরে চলা চীনা আগ্রাসনের ফলে যে সকল উদ্বেগ উৎপন্ন হয়েছে তারমধ্যে এটাও একটা যে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতির লাভ ওঠাতে চাইছে চীন। সেজন্য চীন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নতুন রেললাইন বসানো ও রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে— যা ভারতের পক্ষে খুবই উদ্বেগের বিষয়। কাশ্মীরের এই এলাকা থেকে চীন তার শিনচাঙ্ প্রদেশকে পাকিস্তানের করাচী বন্দর পর্যন্ত যুক্ত করার পরিকল্পনায় যোজনাবদ্ধ কাজ শুরু করে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আরো একটি দুশ্চিন্তার বিষয় হলো— দৌলত বেগ ওলডি সেক্টরে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিমান বন্দরের ওপর চীনের লোলুপদৃষ্টি। এটি ভারতীয় বায়ুসেনার তিনটি অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডের মধ্যে একটি এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ১৬২০০ ফুট উঁচু।

পাকিস্তানের গোয়াদর বন্দরে চীনের লগ্নী, ব্রহ্মপুত্রনদে বাঁধ নির্মাণ এবং পাকিস্তানের চশমা বিদ্যুৎ পরিযোজনায় চীনা পরমাণু রি-অ্যাক্টরের নির্মাণও ভারত সরকারের কাছে কম দুশ্চিন্তার নয়। এ বিষয়ে চীন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সফল হচ্ছে। ভারত-চীন সীমাবিবাদ ৪ হাজার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে— ভারত সরকার এ বিষয়টি গত এক দশকে আন্তর্জাতিক স্তরে ওঠাতে ব্যর্থ হয়েছে— যেখানে চীনের দাবি অরুণাচলপ্রদেশের ওপর। চীন অরুণাচলকে দক্ষিণ তিব্বত বলছে।

চীনের চেয়ারম্যান জি জিপিং-এর সঙ্গে হামিদ আনসারি।

কয়েক দশকের পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের জলবিবাদ চলার সঙ্গে সঙ্গে চীন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা নিজে ব্রহ্মপুত্রে ফেলছে এবং অন্য দেশের আবর্জনাও পয়সার বিনিময়ে এনে ফেলছে।

গত বছর ভারতের নরম মনোভাবের কারণে চীনের দুঃসাহস বেড়ে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে চীনাসেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ১৯ কিলোমিটার অনুপ্রবেশ করেছিল। তখন আশ্চর্যজনকভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সমস্যাকে 'স্থানীয় ও সীমিত সমস্যা' বলে বয়ান দিয়ে হাসির পাত্র হয়েছিলেন।

খুবই আশ্চর্যজনক তথ্য যে, বাণিজ্যিকস্তরে আমাদের চীনের উৎপাদিত দ্রব্য নয়, বরং চীনের বাজারে আমাদের দ্রব্য যাওয়া প্রয়োজন। গত বছরে মায়ানমারে আয়োজিত 'ব্রিক' সম্মেলনে মনমোহন সিংহ পুরনো বিবাদ ছেড়ে চীনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক ও বিষয় নিয়ে কথাবার্তা স্বীকার করে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন ভারতকে তার ভারী মূল্য চোকাতে হয়েছে। মায়ানমারে মনমোহন সিংহ অরুণাচল, কাশ্মীর, গোয়াদর, তিব্বত, ৪ হাজার কিলোমিটার সীমাবিবাদ, ভারত মহাসাগরে চীনা হস্তক্ষেপ, দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে বর্ধিত চীনাপ্রভাব, কাশ্মীরের যুবক-যুবতীদের ভারতীয় দস্তাবেজের স্থানে স্থানীয় তথ্যের ভিত্তিতে চীনা ভিসা দেওয়া, ব্রহ্মপুত্রনদের উপর অবৈধ বাঁধ নির্মাণ ও তার গতিপথ বদলে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা ভুলে যাওয়ার প্রয়োজন কী, তা বুদ্ধির অতীত।

এখন মোদী সরকারকে ইউপিএ সরকারের ওই সিদ্ধান্তের সমীক্ষা করতে হবে যা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ চীন প্রবাসের সময় ভারতে চীনা শিল্প-পরিসর বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যাতে কেবল চীনা দ্রব্যই উৎপাদিত হবে এবং তাতে অনেক প্রকার ছাড় ও অনুদান প্রদান করার কথা আছে। এতে একটি কথা পরিষ্কার যে, এর ফলে চীন সস্তা ও নিম্নমানের জিনিসে ভারতের বাজার ভরে ফেলবে। ফলে ভারতের বাজার ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারত-নেপাল বাণিজ্য চুক্তিরও অনুচিত লাভ ওঠাতে শুরু করেছে চীন।

ভারত-চীনের মধ্যে আর্থিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনেক এরকম তথ্য আছে যা ভারতীয় দৃষ্টিতে গভীর চিন্তার বিষয়। এখন শুধু দেখার যে, বিগত সরকারের ভুলত্রুটিগুলি মোদী সরকার কীভাবে নিষ্পত্তি করে। ইতিহাস সাক্ষী— চীন নেহরুর সময় থেকে কয়েকদিন আগেও মনমোহন সিংহের সময় পর্যন্ত ভারতকে শুধু ধোঁকাই দিয়ে এসেছে। এখন নরেন্দ্র মোদীর আমলে কীরকম ব্যবহার করে তা দেখার বিষয়।

(তথ্যসূত্র : হিন্দুস্থান সমাচার)

চিঠিপত্র

নির্বাচন ও সংখ্যালঘু ভোট

যখন থেকে ভারতে ভোটতন্ত্র চালু হয়েছে সেই ১৯৫২ থেকে সব মহলে একটা ধারণা চালু হয়েছে। যে দল সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমান ভোট পাবে সেই দল-ই ভোটে জিতবে। কারণ ভারতে হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের সেই ভোট বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। আর মুসলমানরা সাধারণত এককাট্টা হয়ে একটি দলকে ভোট দেয়। তাই সংখ্যালঘু হলেও যে দল তাদের ভোট পাবে সেই দলের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। প্রায় সব রাজনৈতিক দল, সব সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিক এ বিষয়ে একমত। তাই তাঁদের সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে শাসক কংগ্রেস যতই দুর্নীতিবাজ অপদার্থ হোক 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপি কোনোদিন ভোটে জিততে পারবে না বা দেশ শাসন করতে পারবে না। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে উঠে এলেও তারা কোনোদিন ম্যাজিক ফিগার ২৭২-এ পৌঁছতে পারবে না। অন্য কোনো 'ধর্মনিরপেক্ষ' দল এই 'সাম্প্রদায়িক' দলকে সমর্থন করবে না। আর মুসলমান ভোট না পেলে কোনোক্রমে বিজেপি-র পক্ষে ভোটে জেতা সম্ভব নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ তো ৩৩৫টি আসন পেয়ে গেল, অধিকন্তু বিজেপি একাই ২৮২ আসন দখল করে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। বিজেপি বিরোধী দলগুলির এখন 'ধরিত্রী দ্বিধা হও' গোছের অবস্থা।

এখন দেখা যাক কি করে বিজেপি-র পক্ষে এত আসন লাভ করা সম্ভব হলো। মোদি ঝড়? হ্যাঁ তা তো ছিলই। কিন্তু মুসলমানরা তো বিজেপি-কে ভোট দেয়নি। যাওবা দু'একটা দিত তাদের মধ্যে ক্রমাগত বিজেপি ও মোদী-বিরোধী ভীতির সঞ্চার করার ফলে তাও দেয়নি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। তথাপি বিজেপি এত আসন পেল কি করে যে একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। তার প্রধান কারণ আগে যা হোত না এবার তাই হয়েছে, সব হিন্দু ভোট এককাট্টা হয়ে বিজেপি-র অনুকূলে পড়েছে, আর মুসলমান ভোট বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। হিন্দুদের ভোট এই একাকাট্টা করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আর এস এস এবং বিজেপি কর্মীদের। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় এই আপাত অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরপ্রদেশে যেখানে প্রায় ২০ শতাংশ মুসলমানের বাস (কোনো কোনো জায়গায় ৪২ পর্যন্ত) সেখানকার ৮০টি আসনের মধ্যে ৭৩টি বিজেপি পেয়েছে যা এক রেকর্ড। কারণ এখানে অমিত শাহ প্রায় এক বছর মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সব হিন্দুভোট বিজেপি-র অনুকূলে কনসোলিডেট করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে বিজেপি-র জয়-জয়কার।

এবার আসি পশ্চিমবঙ্গের কথায়। পশ্চিমবঙ্গে এখন মুসলমানদের সংখ্যা ২৭ শতাংশ যার অধিকাংশের (অন্তত ৭০ শতাংশ) বা তিনটি জেলায়— মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর। এই তিন মুসলমান অধ্যুষিত জেলা কংগ্রেসের দুর্গ। এখানে বিজেপি তো দূরের কথা তৃণমূল কংগ্রেসও দাঁত ফুটোতে পারে না। এখানে তাদের কোনো আসন নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাকি বৃহৎ অংশে মুসলমান জনসংখ্যা ১০/১২ শতাংশের বেশি হবে না তাই উত্তরপ্রদেশে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ২০ শতাংশ কোনো অঞ্চলে ৪২ শতাংশ পর্যন্ত— সেখানে যদি বিজেপি সব আসনে জিততে পারে তবে এইখানে এই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর অংশে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ১০/১২ শতাংশ সেখানে বিজেপি জিততে পারবে না কেন? দরকার শুধু হিন্দু ভোট কনসোলিডেট করার।

সুহাস বসু,
কলকাতা-৬০।

জনগণের পয়সা খরচের নবতম উপায়

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিছু বিষয় বিশেষ ভাবে নজরে আসছে—

(১) বিধায়ক বা সাংসদের এলাকা উন্নয়নের তহবিলে যে কাজটি হচ্ছে তার বৃহৎ অংশ ওই বিধায়ক বা সাংসদের নাম প্রচারে খরচ হচ্ছে। যেমন, সুদৃশ্য প্রস্তর ফলক বা আলোকিত ধাতব ফলক নির্মাণে। এখানে প্রশ্ন টাকা তো জনগণের করের? সেখানে বিধায়ক বা সাংসদের ব্যক্তিগত নাম দেওয়ার কি দরকার? হতে পারতো সংশিষ্ট বিধানসভা বা লোকসভার নাম। কেননা বিধায়ক বা সাংসদ নিজের একটি পয়সাও খরচ করেনি। এটা অবিলম্বে বন্ধ হোক।

(২) বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েতে দেখা যাচ্ছে পৌরমাতা পৌরপিতা বা পঞ্চায়েত প্রতিনিধির নাম দিয়ে ইদ বা পুজোয় শুভেচ্ছা জানানো যা সমাজে সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর, এটা বন্ধ হওয়া উচিত।

(৩) জনগণের করের টাকা খরচা করে মাদ্রাসা মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা দিচ্ছে। আচ্ছা, যদি মাদ্রাসা বা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সকলকে সংবর্ধনা দিতে এত বিপুল সরকারি খরচ হয় তাহলে যৌনকর্মীরাই বা বাদ যাবে কেন? তারাও তো সমাজসেবী, তাদের জন্যই তো এখনো কিছু মহিলা পথে ঘাটে চলতে পারছে। আমি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ বিষয় দাবি জানাচ্ছি!

সুশীপ্র মল্লিক,
কলকাতা-৭০০০১৪।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

দিশাহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা

বাণীব্রত মিত্র

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কলেজে পড়িয়েছি। সুতরাং শিক্ষা নিয়ে দু'চার কথা বলার অধিকার আমার থাকতেই পারে। কিন্তু কেই বা শুনবে আমাদের মতো হতভাগ্য মাস্টারমশাইদের কথা। মত্ত শাসককুলের কাছে নীতির কথা বা উপদেশ বড়ই বেমানান। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নিজেদের অর্থাৎ শিক্ষক সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে নেওয়াই শ্রেয়। আগেকার দিনে শিক্ষকদের মাস মাইনে খুবই কম ছিল। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলতো না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একটা নীতিবোধ ছিল। যেন খানিকটা আত্মত্যাগের জন্যই 'শিক্ষকতা' জীবিকা হিসাবে বেছে নিতেন। কিন্তু আজ যখন শিক্ষককুল মোটা অঙ্কের মাস মাইনে পান— তখন কিন্তু এঁদের অনেকেই শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিজেদের বিরত রাখেন। নির্লিপ্ত মনোভাব। শাসকের রক্তচক্ষু, অন্যায় আবদার মুখ বুজে সহ্য করেন। কেউ বা শাসকের কৃপাধন্য হবার তাগিদে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে যত্রতত্র ছোটাছুটি করেন। এনাদের এই সুবিধাবাদী মনোভাব কিন্তু ছাত্ররা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করে। বেশিরভাগ ছাত্রই আজ তাই মাস্টারমশাইদের এড়িয়ে চলে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আজ তলানিতে ঠেকেছে। একজন ছাত্র নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— আচ্ছা তোমরা পড়াশুনা করো না কেন? উত্তরে ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করেছিল— আপনারা তো স্যার লেখাপড়া জানা লোক। আপনাদের মতো লেখাপড়া জানা লোকরাই তো শিক্ষার এই হাল করে ছেড়েছেন। তবে আর লেখা পড়ার কথা তুলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? এই উত্তরটার মধ্যেই কিন্তু আসল সত্যটা লুকিয়ে আছে। রাজনৈতিক নেতারা যেমন দেশ চালায় দেশ গড়ার আসল কারিগর কিন্তু শিক্ষক সমাজই। এ কথাটা আমরা ভুলে গেছি।

শিক্ষার সঙ্গে চেতনা নামে একটি মানবিক পদার্থের বেশ জোরালো সম্পর্ক আছে। যা দেশের মানুষ আর পরিস্থিতির দিকে চোখ ঘুরিয়ে দেয়। বর্তমানে চেতনায় টান পড়েছে, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা আজ শিক্ষাঙ্গনগুলিকে কলুষিত করে বেড়াচ্ছে। পরিত্রাণের রাস্তা কিন্তু আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় শিক্ষায় রাজনীতিকরণের ঘরানা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৬৭ সাল থেকে। যুক্তফ্রন্ট আমলে। সেই ধারা অনুসরণ করে সত্তর-একাত্তরে সিদ্ধার্থ জমানায়— মাস্টার ঠ্যাঙানো, লাইব্রেরি পোড়ান, গণ-টোকাটুকি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র খুন ইত্যাদি কুকর্মের বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নেতারা নিজেদের আখের গুছিয়েছেন। পরবর্তীকালে বাম জমানায় এই ধারা আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (কমরেড) ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাদের হাতে চলে যায়। উপাচার্য থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংসদগুলির মাথায় দলীয় লোকজনদের বসিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র-সংসদগুলি ছাত্র ফেডারেশন গায়ের জোরে দখল করে নেয়। চরম অরাজকতার মধ্যে চলতে থাকে শিক্ষা ব্যবস্থা। তবে দলবাজির সমস্ত রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে বিগত এই তিন বছরে। তৃণমূলের তিন বছর রাজত্বকালে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা ও নৈরাজ্য, পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষত ছাত্র-যুবকদের কাছে এক আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংঘর্ষ, ছাত্র-ভর্তিতে তোলাবাজি, আবার তোলাবাজদের সুপারিশে উপাচার্যের বিরুদ্ধে তদন্ত এমনকী মন্ত্রী বিদায় পর্যন্ত ঘটে চলেছে। রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের সঙ্গে যোগ হয়েছে বেশকিছু সমাজ-বিরোধী মাশ্‌লম্যানের। এঁরা অনেকেই স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতির সদস্য বা পদাধিকারী। এনাদের অঙ্গুলি হেলনে অধ্যক্ষ, উপাচার্যদের চাকরি চলে যায়! শিক্ষাঙ্গন রক্তে লাল হয়ে উঠে। এক নিদারুণ পরিস্থিতি!

লজ্জার এবং পরিতাপেরও কথা আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসুরি হিসাবে আমরা বেশ কয়েকজন উপাচার্যকে দেখেছি, যাঁরা কিন্তু দৃষ্টিকটু ভাবে রাজনৈতিক দলের সক্রিয়কর্মীর ন্যায় কাজ করেছেন এবং বর্তমানেও বেশ কয়েকজন একই কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক দলের মিছিল মিটিং-এ এদের সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেও দেখা যায়। শিক্ষাবিদ, হিসাবে বা শিক্ষক হিসাবে এঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কি ধরনের আদর্শ তুলে ধরবেন? উপাচার্যের পদটি যে একটি পরম পবিত্র পদ এবং সেই পদকে নিজ স্বার্থের জন্য কলুষিত করা যে একটা ক্ষমাহীন অপরাধ— এ কথাটা যদি উপাচার্যগণ না বোঝেন, তবে ছাত্র-ছাত্রীরা না বুঝলে অন্যায় কোথায়?

একজন শিক্ষক হিসাবে, একজন শিক্ষা দরদি সাধারণ মানুষ হিসাবে আশা করতেই পারি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, যারা এই জটিল, অগ্নিগর্ভ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য সঠিক পথের সন্ধান দেবে। এবং আমাদের মতো হতভাগ্য অসহায় শিক্ষকদের হয়তো বা ক্ষমাও করে দেবে।

(লেখক বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।)

দশাবতার ও ভারতের জাতীয় জীবন

নৃসিংহ-অবতার

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ। কান্তকবি জয়দেবের ভাষায় তাঁর কীর্তিকলাপ এইভাবে ফুটে উঠেছে—

'তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃত নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে।।'

ইনি আপন সুতীক্ষ্ণ নখরে হিরণ্যকশিপুর দেহ ছিন্নভিন্ন করে তাকে হত্যা করেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর এই পরিণতির নেপথ্য কাহিনীটি জানতে পারলে পুরাণকারদের রূপক আশ্রিত এই কাহিনীর মর্মোদ্ধার করা যাবে।

হিরণ্যকশিপু ভারতে রাজত্ব স্থাপনকারী প্রথম বিদেশী শাসক। তার দাদা হিরণ্যাক্ষ প্রথম বিদেশী লুণ্ঠনকারী। তিনি রাজত্ব স্থাপনের চেয়ে লুঠতরাজ, অত্যাচার, দমন-পীড়ন ইত্যাদিতে অধিক মনোনিবেশ করেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। ইনি দৈত্য (অসুর) বংশের ছিলেন। আপন অনুগামী-সহ খাইবার গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। বায়ব্যসীমার (বায়ুকোণ, উত্তর-পশ্চিম দিকের) পাশের প্রদেশ জয় করে তিনি মুলতানে রাজধানী স্থাপন করেন। মুলতানের প্রাচীন নাম 'প্রহ্লাদপুরী'। সেখানে প্রহ্লাদের একটি মন্দিরও আছে। তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপু বর লাভ করেছিলেন যে, না মানুষ না পশু এমন প্রাণীর হাতে, না দিন না রাত্রি এমন সময়ে, না ঘরে না বাইরে এমন স্থানেই কেবল তাঁর মৃত্যু হতে পারবে; শুধু তাই নয়, আরও সাবধানতা অবলম্বন করে তিনি বর চাইলেন, কোনো অস্ত্র বা শস্ত্রেও যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। পুরাণকারের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে হিরণ্যকশিপু কী নিপুণ ক্ষমতায় তার শারীরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এত কঠোর নিরাপত্তার কী প্রয়োজন ছিল? কারণ, তিনি বিদেশী এবং ভারতীয়দের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতেন। তিনি যে কী নিষ্ঠুর ছিলেন, পুত্র প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারের বহর দেখে তা বোঝা যায়। মুষ্টিমেয় লোক অসংখ্য লোকের উপর আধিপত্য চালাতে গেলে অত্যাচারের মাধ্যমেই তা করতে হয়। তবে মুষ্টিমেয় অসভ্য বিদেশী লক্ষ লক্ষ সুসভ্য লোকের উপর শাসন চালাতে থাকলে, ধীরে ধীরে সুসভ্য জাতির প্রভাব শাসকদের মধ্যেও পড়ে। প্রহ্লাদের উপর এমন প্রভাব পড়েছিল। তিনি ভারতীয় আদর্শের অনুগত হয়ে গিয়েছিলেন। হিরণ্যকশিপু কিন্তু পুত্রের এই আচরণ মেনে নেননি। তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয়রা প্রহ্লাদের মাথায় চড়ে বসবে আর রাজ্যপাট লাটে তুলে দেবে। তাই তিনি প্রহ্লাদকে দানবীয় ঘরানায় মানুষ করতে চেয়েছিলেন। যাতে প্রহ্লাদ তাঁর মতো অত্যাচারী হয়। কিন্তু প্রহ্লাদ এই শিক্ষা কিছুতেই গ্রহণ করেননি। ফলে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়। প্রহ্লাদের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কীভাবে পড়ল? হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু গর্ভবতী অবস্থায় নারদের আশ্রমে ছিলেন। সেখানে নিয়ত নারদের মুখে ভজন শুনতেন, নীতিকথা ও প্রবচন শুনতেন, এসবের প্রভাব প্রহ্লাদ ও কয়াধু উভয়ের উপর পড়েছিল। প্রহ্লাদের মনে এদেশের মানুষের প্রতি প্রীতির ভাব জাগলেও, প্রজাদের পক্ষ নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিষ্ণুভক্তিতে আপ্লুত হবেন। যত প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, ভক্তিমার্গ ত্যাগ করবেন না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, বিষ্ণু এদেশের জনসাধারণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতীক। যথারীতি প্রহ্লাদ অত্যাচারিত হতে লাগলেন এবং বিষ্ণুনাম স্মরণ ও কীর্তন করতে শুরু করলেন। জনসাধারণ প্রহ্লাদের পক্ষে হিরণ্যকশিপুর বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে লাগল। যখন জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করল তখন জনশক্তি ভীষণ মূর্তিতে বেরিয়ে এসেছিল, সেই স্তম্ভটি ছিল ক্রুদ্ধ জনশক্তির প্রতীক। তার উপর পদাঘাত করার পর সচকিতে সে ভীষণরূপ ধারণ করল। সেই ভয়ঙ্কর রূপই পুরাণকারের বর্ণনায় নৃসিংহ-অবতার। এই বর্ণনা যে রূপকাশ্রিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই অবতারের মধ্যে নর (নৃ) আর সিংহের অস্বাভাবিক মিশ্রণ রয়েছে। সত্যবৃত্তিতে জেগে ওঠা চেতনা ও প্রাণ হাতে নিয়ে মানুষের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব— এই দুই রূপ মিলে এই অবতারের সৃষ্টি। প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার চাইতেই ক্রুদ্ধ জনতা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে। প্রহ্লাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল— এমন এক স্বাভিমানবোধ যা এই জনবিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। কিন্তু এই জনবিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পনা বা সংগঠিত পথে হয়নি। সিংহের মতো ক্রোধী ও অন্ধ আবেগে পরিণামী জয়-পরাজয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই তারা অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দৈত্যরাজ ও তাঁর সকল প্রধান সঙ্গীদের হত্যা করেছিল। সিংহের ক্রোধের মতো প্রবল

জনশক্তি উদ্বেল হলে তার কোনো রাশ থাকে না। সে সময়ে জনশক্তির রূপ এমন ভীষণাকার ধারণ করেছিল যে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। এমনকী স্বয়ং প্রহ্লাদও বিস্ময়- বিস্ফারিত নেত্রে কেবল দেখে যাচ্ছিল। মনে হয়, এই ঘটনাটি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে জাতীয়তাবোধের প্রথম উদাহরণ।

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই একথা স্বীকৃত হয়ে এসেছে যে, ন্যায় ও নীতি আশ্রিত আচরণের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রকট হয়। এই সব গুণহীন ব্যক্তি মানবশরীরধারী হলেও পশুতুল্য। গুণানুসারে মানুষকে পশুস্বভাব দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। যেমন বিক্রম বোঝাতে সিংহ বা বাঘের সঙ্গে তুলনা করা একটি প্রচলিত রীতি। 'বাংলার বাঘ আশুতোষ' বললে বাঘের বিক্রমের ন্যায় আশুতোষের বিক্রম বুঝি। তেমনই নৃসিংহ বলতে সিংহবিক্রম সম্পন্ন মানুষকে বোঝায়। যাইহোক, নৃসিংহ অবতারের কালে যে জনবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তীকালের ফরাসী-বিপ্লবের জনরোষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কাজের মূলে সৎ-চিন্তা, সাহস ও ত্যাগের গুণ থাকলেও সংগঠিত সামর্থ্য থেকে তা উদগত হয়নি। এতে এক সংযমশীল সমর্থ সংগঠনের অভাব ছিল। সে জন্য গণক্রোধ জ্বালামুখীর মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার অল্প সময়েই শান্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রহ্লাদ খুবই ভালো ছিলেন। কিন্তু একথা সত্য তিনি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র এবং বিদেশী বংশোদ্ভূত। তবুও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে ভারতীয়রা তাঁকে রাজা হিসেবেও মেনে নেয়। প্রহ্লাদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও নীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আকবরের তুলনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন, অল্প বয়সে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং সুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন। যদি বিদেশী শাসন কেবল অত্যাচারীর বলের উপর নির্ভর করে, তবে তার অবসান ঘটানো ততো কঠিন হয় না, কিন্তু যদি সুরাজ্য শাসন চলছে বলে জনসাধারণের বিশ্বাস সৃষ্টি করা যায়, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিমত্তা ও রাষ্ট্রভক্তির সাহায্যে বিদেশীদের হীনবল করে এদেশ থেকে বহিষ্কার করার এক চেষ্টা হয়েছিল। সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো বামন-অবতারে দৈত্যরাজ কলিকে পাতালে পাঠানোর মাধ্যমে। ■

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

Member of: TAAB Travel Agents Association of Bengal

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

ভ্রমণ	মূখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভযাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
পুরী	ভুবনেশ্বর, নন্দনকানন, ধবলগিরি, খন্ডগিরি, লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক	৬	১লা সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩৮০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লক্ষ্মণঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৪	৫৮০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর ৭০দিন আগে বুকিং করুন

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস) লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স, গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ী ভাড়া।

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত যিনি নানান ঝঙ্কারে

দেবাদৃতা সমমিতা আর শরণ্যাকে বলেছিলেন দিদিমণি 'গানের কথাগুলো বার বার পড়বে। তাহলে বুঝতে সুবিধে। মনে রাখতেও। গান গাইবার সময় মুখস্থ থাকলে সহজ হয় গাওয়া। যারা শুনছে তাদেরও ভালো লাগে।' ওরা তিনজনেই গানটা মনে ধরে নিয়েছিল সমস্ত যতিচিহ্ন সমেত। দিনকয়েক বাদে একটা অনুষ্ঠানে গাইতে হবে ওদের। তার আগে কদিন ধরে রেওয়াজ চলেছে। দিদিমণি নিজে তিনবার পড়ে দিয়েছিলেন গানটা। ওদের বলেছিলেন, 'একেকজন করে পড়ো।' কারও কারও পড়ায় সামান্য ভুল হয়েছিল। ওদের দিদি শুধরে দিয়েছেন। দেবব্রত বিশ্বাস নিজেকে 'সুর আবৃত্তিকার' বলতেন। গান গাওয়ার সময় প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ ছিল নিখুঁত। যাদের শেখাতেন তাদের বলতেন, 'গানের ভিতরে ঢুকতে গেলে গানের কথাগুলো ঠিকভাবে শেখা চাই।' দেবাদৃতাদের একই কথা বলেন দিদিমণি।

গানটা রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন তখন তাঁর বয়স ৪৮ বছর। নোবেল পুরস্কার পাননি। কাজ করে চলেছেন অনেক। কিংবা কাজ তাঁকে ব্যস্ত রেখেছে। তার মধ্যে কদিনের জন্যে বেড়াতে গেছেন কার্শিয়াং-এর কাছে তিনধারিয়ায়। বিশ্রামের কটা দিনেও গান তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। পরপর কয়েকটা গান লেখা হয়ে গেল। ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ লেখা গানের নিচে। তার মানে ১০৪ বছর আগের ঘটনা। ওইরকম একটা গান সৃষ্টি তো ঘটনা বৈকি।

গীতবিতান-এ পূজা পর্যায়ে গানটি রয়েছে। ২২২ নম্বর। গীতাঞ্জলির ৭৪ নম্বর গান। স্বরলিপি তৈরি করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরবিতান-এর ১৩ নম্বর খণ্ডে গানটি রয়েছে। দেবাদৃতাদের সামনে অনেকগুলো তথ্য চলে এলো। তা আসুক গানটা ভালো করে গাইতে হবে— এটা মনে রেখেছে দেবাদৃতারা।

বেশি বড়ো নয় গানটা। কিন্তু গানের অর্থ যথেষ্ট গভীর। কার উদ্দেশে এ গান রচনা? নিজের জন্যেই। আত্মগত ভাবনাকে একটার পর একটা শব্দে ধরে নেওয়ার চেষ্টা। দেবাদৃতা পড়তে শুরু করল। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান! /সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।।' একটু থেমে পরের অংশে গেল ওরা। 'আমি ভুলব না আজ সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে / মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।।' ওরা ফিরে গেল প্রথম অংশে। কথা আর সুর মিলে যাচ্ছে।

এরপর চলে আসা শেষ অংশে। 'সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে/সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।'/আত্মস্থ হয়ে শেষে গাওয়া 'আরাম হতে ছিন্ন করে সেই গভীরে লও গো মোরে/ অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।'

গানটা আরও দুবার গাইল ওরা। দিদিমণি বললেন, 'ঠিক আছে। অনুষ্ঠানের দিন গাইবার আগে একটু রেওয়াজ করে নিও। বাড়িতেও অভ্যেস করো।' অনুষ্ঠানের দিন ওদের গাওয়া গান একমনে শুনছিল দেবাদৃতার পিসি। প্রতিটি শব্দ মনের গভীরে গেঁথে যাচ্ছিল। ১০৪ বছর আগে লেখা গান আজও তাজা প্রাণবন্ত। চিরকালের সত্য উচ্চারিত কথা কটির মধ্যে।

পিসির সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় দেবাদৃতা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল তোমার?' পিসি বলল, 'তোরা যখন গাইছিলি তখন মনে মনে আমিও গাইছিলাম। এ গান কোনোদিন পুরনো হয় না।' বাড়ি ফিরে খোলা মেজাজে গানটা ধরল দেবাদৃতা। পিসিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করল। দেবাদৃতার মনে হলো, পিসি অনেকক্ষণ ধরেই গানটা গাইতে চাইছিল। ■

ট্রেনে ডাকাত ধরা

কৌশিক গুহ

গল্প বলার আসর আষাঢ় মাসে নাকি ভালো হয়। আষাঢ় মাসের দিন বেশি বলে গল্প বেশি করা যায় ভেবে এমন কথা বলা? যাই হোক আষাঢ়ের শেষ দিনে অজয়-স্যার বললেন, 'আজ হবে গল্প তৈরির ক্লাস।' ছেলেরা খুব খুশি। প্রতিদিনের পড়ার থেকে একটু অন্যরকম বলেই আনন্দ। অজয়-স্যার এমনভাবে পড়ান যা প্রত্যেক ছেলের ভালো লাগে। তারা মন দিয়ে ক্লাস করে। মাসে একদিন গল্পের ক্লাসও বেশ মজার।

দশ-বারোজন গল্প বলে। বাকিরা শোনে। গল্পের শুরুটা স্যার বলে দেন। একটা বা দুটো বাক্য। তারপর যার নাম ডাকা হয় সে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঘণ্টা বাজতে সে থামে, তারপর আরেকজন শুরু করে। ওইভাবে দশজন বলবে। স্যার বেছে নিলেন দশজনকে। বললেন, 'গরমের ছুটিতে ফেরার সময় ট্রেন ঠিক সময়ে ছাড়ল। ওরা চড়েছে দিল্লী থেকে।' স্যার বললেন, 'দেবাশিস।'

দেবাশিস বলল, 'দশজন দলে। ট্রেনে ওঠার আগে দেখে নেওয়া প্রত্যেকে নিজের বোঝা ঠিকমতো নিয়েছে কিনা। কয়েকটা বাড়তি বোঝা আছে তার ভার দায়িত্বশীল কয়েকজনের কাছে। যাদের সবদিকে লক্ষ্য থাকে।' ঘণ্টা বাজল। স্যার নাম ডাকবেন, 'নভোদীপ'।

নভোদীপ বলতে শুরু করল, 'আকাশ, তীর্থঙ্কর, শেখর, দ্রোণ বেশ সাহসী আর গায়েও জোর আছে। খেলাধুলো করে। শেখর আর আকাশ ক্যারাটে শেখে। ওরা দায়িত্বশীল বলে বাড়তি বোঝা ওদের কাছে ছিল।' ঘণ্টা বাজল। নাম এবার 'অর্জুন'।

অর্জুন বলা শুরু করল, 'সমিত সবসময় পড়ে। হাতের কাছে কিছু-না-কিছু রাখে। ট্রেন ছাড়তেই সে একটা বই-এর মধ্যে ডুবে গেল। দ্রোণ বাড়িতে জানিয়ে দিল আমাদের ট্রেন ছেড়েছে ঠিক সময়ে।' ঘণ্টা বাজল। পরের নাম 'পৃথ্বীশ'।

পৃথ্বীশ বলতে শুরু করল, 'জীবন আর বিকাশ শুয়ে পড়ল। বলল, খুব ধকল গেছে। আর পারছি না। একটু ঘুমিয়ে নিই। রাতে খাওয়ার আগে ডাকিস না।' আকাশকেই বলল। কারণ সেই রয়েছে নেতৃত্বে।' ঘণ্টা বাজল। স্যার ডাকলেন 'অনির্বাণ'।

অনির্বাণ কথা শুরু করল, 'বিপুল অধীর আর দিবাকর কথা বলতে লাগল খেলা নিয়ে। বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে তখন চারদিকে শুধু আলোচনা মাতামাতি। ওরা কিছুক্ষণ আলোচনা করে থামল।' ঘণ্টা বাজল। এবার নাম, অশোক।

অশোক বলল, 'রাতের খাওয়া শেষে সকলে শুয়ে পড়েছে। সমিত জেগে বই পড়েছে একমনে। বইটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুমোবে না। হঠাৎ তার কানে একটা অন্যরকম আওয়াজ পৌঁছল।' ঘণ্টা বাজল। পালা এবার : 'দিবাকর'।

দিবাকর বলল, 'সমিত বই বন্ধ করে দ্রোণকে জাগিয়ে দিল। তারপর ওরা কয়েকজন জেগে গেল। বুঝতে পারল ডাকাতরা খেলা শুরু করেছে। লোকগুলো দিল্লী থেকেই উঠেছিল। দলে চারজন। মুখ ঢাকা। হাতে ছুরি।' ঘণ্টা বাজল। এবার নাম : 'সুব্রত'।

সুব্রত শুরু করল, 'কামরার একদিকে ছিনতাই শুরু হয়েছে। হিন্দিতে কথা বলছে। তীর্থঙ্কর বলল, 'চুপচাপ থাক। এদিকে এলে আমরা ওদের জব্দ করার চেষ্টা চালাবো। তৈরি থাক তোরা।' ঘণ্টা বাজল। এবার : 'রাকেশ'।

রাকেশ বলল, 'ডাকাত চারটে জানে চটপট লুঠ করতে হবে। আকাশদের কাছে এসে বলল, 'যা আছে দিয়ে দে।' আকাশ বলল, 'দেবো বলে বেরিয়েছি নাকি?' লোকটা অস্ত্র তুলতেই আকাশ তার হাত মুচড়ে কাবু করে ফেলেছে।' ঘণ্টা বাজল। পরের নাম : 'অমিত'।

অমিত শুরু করল গল্পের শেষ অংশ, 'এরমধ্যে শেখর দ্রোণ আর বিকাশ তিনজনকে ধরে ফেলেছে। কামরার অন্য লোকজনও এসেছে। আকাশদের দলের প্রত্যেকে ডাকাত ধরায় অংশ নিয়েছে। চারজনকে বেঁধে ফেলা হলো। আকাশ জানাল, রেলের গার্ডকে। পরের স্টেশনে ডাকাতদের নামানো হলো। রেল-রক্ষীদের হেফাজতে চলে গেল। আকাশরা অনেক কাগজপত্রে সই করল। তাদের ছবি উঠল। রেলের কর্তারা ওদের পুরস্কার দেবার কথা বললেন। দ্রোণ বলল, 'আগে ট্রেন চালান। বাড়ি ফিরতে দিন।' গল্প শেষ।

অজয়-স্যার বললেন, 'ভালোই হয়েছে আমার মত। যারা শুনলে তাদের কেমন লাগল?' সকলে বলল, 'বেশ হয়েছে। তবে আরও কিছুক্ষণ চললে ভালো হোত।'

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

জন্মদিনে দেবরূপ-স্যারের দেওয়া বই

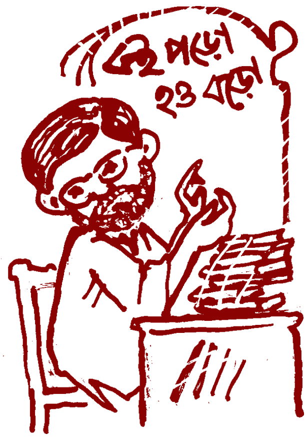

অনেকেই খুব কষ্ট করে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে— এটা জানে দেবরূপ। নতুন স্কুলে যোগ দেওয়ার পর একমাসের মধ্যে ভালোমতোন পরিচয় হয়েছে তিনটে ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে। প্রত্যেকের নাম জানার পর শুনতে চেয়েছে বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছে, বাবা মা কি করেন। জেনে নিয়েছে কার কবে জন্ম তারিখ আর কে কি পছন্দ করে। তিনটে ক্লাসের অত ছেলের শখ আর জন্ম তারিখ মনে রাখা সম্ভব নয়। একটা ছোট নোট খাতায় লিখে নিয়েছে। মাস তারিখ ধরে ধরে লেখা। বুঝতে সুবিধে। সুজনের জন্ম ৪ আগস্ট। একদিন আগে ক্লাসে এসে দেবরূপ ডাকল সুজন চক্রবর্তীকে। একটা কার্ড উপহার পেলো সুজন। সেইসঙ্গে বই দেবরূপ স্যারের কাছে। খুব খুশি সে। নানারকম বই পড়তে ভালোবাসে সুজন। সে উপহার পেয়েছে 'চাঁদের পাহাড়'। দেবরূপ কারও প্রণাম নেয় না। সুজন প্রণাম করতে যেতে তার হাত ধরে বারণ করে হেসে বলে, 'পড়াশোনা করে বড়ো হও।' এটাই মূল কথা সকলকে। তবে কোনো কার্ড ছাপা নয়। স্যারের হাতে তৈরি।

দেররূপ ঠিক করে নিয়েছে মাসে বইপত্র মাসে দেড় হাজার টাকার কিনবে। নিজের জন্যে থাকবে তেমনি অন্যদের দেওয়ার জন্যেও। অনেককে দেখেছে, ভালো মাইনে পাবার পর পড়াশোনার অভ্যেসটা বন্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি। বই-এর ব্যাপারে দেবরূপ সবসময় সক্রিয়। সে দেখেছে, ছেলেদের জন্মদিনে একটা কার্ড দিলেই দারুণ আনন্দ পায় যারা তাদের কার্ড দিতে সামান্য খরচ। বইয়ের জন্যে বরাদ্দ পঞ্চাশটা টাকা। বই কেনার সময় খেয়াল রাখতে হয় কাকে কি বই দেওয়া হলো। সেজন্যে দেবরূপ একটা নোট বই সঙ্গে রাখে। ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ছেলেদের কাছে। অসীম বলেছিল, 'আমাদের বাড়িতে কারও জন্মদিন উপলক্ষে কিছু হয় না।' দেবরূপ জেনেছিল অসীমের বাবা নেই, মা খুব কষ্ট করে সংসার চালান। অসীম বড় আনন্দে জন্মদিনে স্যারের দেওয়া উপহার মাকে দেখিয়েছিল। মা বলেছিল, 'বইটা যত্নে রাখো। কার্ডটাও।'

কারও কারও বাড়িতে জন্মদিনে বেশ ঘটা হয়। অনেকরকম উপহার পায়। দেবরূপ-স্যার জিগগেস করে, 'কি কি বই পেয়েছো জন্মদিনে?' তারা বলেছে, 'আপনি ছাড়া কেউ বই দেয়নি।' দেবরূপ কারও বাড়িতে যায় না। তার স্পষ্ট কথা, 'যাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো তাদের বাড়িতে উৎসবের চেহারা একরকম আর যাদের অবস্থা ভালো নয় তারা কোনো আয়োজনই করতে পারে না। আমার কাছে সকলেই ছাত্র। একরকম দেখি। বাড়িতে যেতে চাই না। ছাত্রের জন্মদিনে কার্ড আর বই দেওয়ার মধ্যে আমার আনন্দ আছে। আর বেশি কিছু নয়।' ছাত্রেরা স্কুল ছেড়ে যাওয়ার পরেও ভোলেনি দেবরূপ-স্যারকে। জন্মদিনে কার্ড আর বই পায় না আর। তবে পুরনো কার্ড আর বই বের করে দেখে। মনে হয় সারাজীবনের জন্যে শুভেচ্ছা লেখা : 'বই পড়ো। সবকিছুতে হও বড়ো।'

বইমিত্র

বনের শত্রুরা চারপাশে

অঙ্গনা

প্রসূতি কল্যাণ-ভাবনার কয়েকটি দিক

শুভশ্রী দাস

প্রসূতি মায়েরাই জাতির মা। তবু এই মায়েরাই অবহেলিত সবচেয়ে। 'টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস'-এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, প্রসূতি সহায়তা সম্পর্কিত বর্তমান প্রকল্পগুলির লাভ পাওয়ার যে শর্ত নির্ধারিত করা হয়েছে তাতে নির্মমতার কারণে ১০.১ কোটি শারীরিক পরিশ্রম করে দিনাতিপাত করা মহিলাদের মধ্যে ১০ কোটিই অর্থাৎ ৯৯.৭ শতাংশ প্রসূতি সহায়তা আওতার বাইরে পড়ে যান। ভারত সেই ১০টি দেশের মধ্যেই পড়ে যেখানে পৃথিবীর ৫৮ শতাংশ মায়ের প্রসবকালীন মৃত্যু হয়। অন্য ন'টি দেশ হলো— নাইজিরিয়া, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, তানজানিয়া, কেনিয়া, চীন ও উগান্ডা। গত ১০ বছরে সংস্থাগত প্রসব বাড়িয়ে দিয়ে এই চিত্র বদল করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যে দেশে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকের ৪০ শতাংশ পদ শূন্য, হাসপাতালে ২৫০০ রোগী পিছু মাত্র ১টি বেড, ওষুধপত্র ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা নেই সেখানে সংস্থাগত প্রসবে প্রসূতি সুরক্ষার আশা করা তো বাতুলতা মাত্র।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের তাজা রিপোর্ট অনুযায়ী—২০১৩ সালে ভারতে ৫০ হাজার (১৭ শতাংশ) ও নাইজিরিয়ায় ৪০ হাজার (৪০ শতাংশ) প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ প্রসূতি-মৃত্যু এই দুই দেশেই হয়েছে। দুঃখের কথা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই তথ্য সামনে আসার পরেও প্রসূতি সহায়তার জন্য কোনো জোর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। সরকার ও সমাজের ধারণা— হাসপাতালে প্রসব হলেই প্রসূতি মায়েদের প্রতি সব দায়িত্বই পালন করা হচ্ছে। এটা কেউ ভাবছেন না যে, একজন মা'কে কেবল ৪৮ ঘণ্টার জন্য হাসপাতালে রাখার চেয়ে তাঁকে সুরক্ষিত মাতৃত্বের আশ্বাস দেওয়া বেশি জরুরি। স্বাস্থ্য ও সুরক্ষিত মাতৃত্ব সম্পর্কিত সরকারি ব্যবস্থা এই বার্তা দেয় যে, গর্ভাবস্থায় মায়েদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া অপরিহার্য। অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের একদিনও কাজে না আসা প্রায় অসম্ভব হয়। তাঁরা তো প্রসবের আগে পর্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের কাজে যুক্ত থাকেন। দ্বিতীয় বার্তা— প্রসূতি মায়েদের পর্যাপ্ত পৌষ্টিক আহার পাওয়া চাই। একটি জাতীয় সমীক্ষা অনুসারে, গ্রামে প্রতি ব্যক্তি প্রতিদিন ডালের জন্য ১.৩১ টাকা, দুগ্ধজাত খাদ্যের জন্য ৩.৮৩ টাকা, মাস, মাংস, ডিমের জন্য ২.২৮ টাকা খরচ করে। শহরে ডালের জন্য ১.৭০ টাকা, মাছ-মাংস, ডিমের জন্য ৩.২ টাকা খরচ করে। অনুমান করা যেতে পারে গর্ভবতী মায়েরা এই অবস্থায় কতটুকু পুষ্টিকর খাবার পায়। এর অতিরিক্ত শুধুমাত্র আর্থিক বিপন্নতাই নয়, নানাবিধ অত্যাচার ও শোষণ তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ভারতে হিতগ্রাহীমূলক যোজনার ৫০ বছরের ইতিহাসে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত ১৯টি প্রকল্পের মধ্যে প্রসূতি সহায়তার সঙ্গে যুক্ত একটি যোজনাও আইনিরূপ পায়নি। বর্তমানে প্রসূতি সহায়তা প্রকল্পের লাভ নেওয়ার জন্য কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেমন— প্রসূতির বয়স ১৯ বছর হতে হবে। দু'টি সন্তানের বেশি হওয়া চলবে না। সংস্থাগত প্রসব হওয়া অনিবার্য ইত্যাদি। এসব পর্যালোচনা করেই 'টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস' জানিয়েছে— ৯৯.৭ শতাংশ মা'ই প্রসূতি সহায়তার বাইরে থেকে গেছে।

২০১৩ সালে তৈরি হওয়া জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে প্রত্যেক মহিলাকে প্রসূতি সহায়তার অন্তর্গত নিয়মমতো ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তামিলনাড়ু সরকার ১৯৮৭ সাল থেকে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মহিলাদের দুই কিস্তিতে ১২ হাজার টাকা প্রসূতি সহায়তা হিসাবে দিয়ে চলেছে। প্রতি বছর ১৬০০ মহিলা এই সুযোগ পাচ্ছেন। বড় কথা, এখানে কোনোরকম ভ্রষ্টাচারের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিগত কেন্দ্র সরকার কিছু নির্মম শর্তসহ 'ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ' যোজনা শুরু করেছে। কিন্তু এই যোজনা এখন পর্যন্ত দেশের ৫২টি জেলায় সীমাবদ্ধ আছে।

২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে চালু হওয়া জননী সুরক্ষা যোজনায় প্রসূতি সহায়তাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে প্রসব হলে এই যোজনা অনুসারে ৫০০ টাকা ও হাসপাতালে হলে গ্রামের ক্ষেত্রে ১৪০০ টাকা এবং শহরে ১ হাজার টাকা সহায়তার ব্যবস্থা আছে।

ভারতে ২০ কোটি মহিলা ঘরেই কাজ করেন। তাঁদের কাজের পরিমাপ করার কোনো আইনি ব্যবস্থা নেই। যদি কোনো শ্রমিক মহিলা গর্ভবতী হোন তো তাঁর পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন নেই? বিশ্রামের সময় তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে? এই মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া আবশ্যিক নয়? প্রসবের পর ছ'মাস পর্যন্ত শিশুর মায়ের দুধ পাওয়া ও অন্য সংবেদনশীল অবস্থার তদারকি প্রয়োজন হয়। যদি ১৫ দিনের শিশুকে নিয়ে মা কাজ করতে যান তাহলে মা ও শিশু দু'জনেরই স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে না। এ সময় মাকে কমপক্ষে ছ'মাস কঠিন পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। দেশের নতুন সরকার যদি এসব বিষয়ে নজর দেয় তবে প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেক কমে যাবে। মহিলাদের জন্য 'আচ্ছে দিন' আনার জন্য ব্যাপকভাবে 'প্রসূতি সহায়তা'কে আইনি আওতায় আনতে হবে। দুঃখের বিষয়, বিগত সরকার এ ব্যাপারে কোনো নজরই দেয়নি।

দুই রাষ্ট্র, দুই মিত্র

অতিথি কলম

সৌরভ জ্যোতি শর্মা

ভারত ও জাপান এশিয়া মহাদেশের দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরস্পর খুব নিকট এবং দুই দেশের মধ্যে বরাবরের সৌহার্দ্য সম্পর্ক। ভারতের 'পূর্বে দেখো' নীতির যে উষ্ণ সম্পর্ক তাই আজ দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরো নিবিড় করেছে। এতদিন সবকিছু ঠিকঠাক চলে এসেছে, কিন্তু কেন্দ্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায়, আবার জাপানে ২০১২-এ গঠিত হয়েছে সিনজো আবের সরকার। এই দুই সরকারের মধ্যে যে পারস্পরিক সখ্যতা তৈরি হয়েছে ভবিষ্যতে তা দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। এশিয় গণতন্ত্রের একটি হলো মোদীময় ভারত এবং অন্যটি আবে-র জাপান। দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের সুফলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে উভয় দেশের মানুষ।

অভূতপূর্ব জয়ের আগে গান্ধীনগরের ওয়ার রুমে বসে মোদী বার্তা পান কেউ একজন ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। তারিখটা হলো মোদী জয়ের দিনটি অর্থাৎ ১৬ মে। ফোনের অপর প্রান্তে যে ব্যক্তি কথা বলতে চান তিনি আর কেউ নন টোকিও থেকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী আবে। ১৫ মিনিটের অভিনন্দন বার্তা বিনিময়ের পর

কম্যুনিস্ট চীন ও জাপান সম্পর্ক মধুর নয়। মোদীকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে কৌশল নিতে হবে দুই বিবাদমান এশিয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে। সেই সঙ্গে আবে-ময় জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্থির হয় ২৬ মে মোদী প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হবার পরই তাঁর প্রথম সরকারি সফর তালিকার শীর্ষে থাকবে জাপান সফর।

মোদী এবং আবে দুজনেই তৎপর, প্রযুক্তিপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা এবং দু'জনের ওপর বহু আশা জড়িয়ে দুই দেশের আমজনতার এবং এই দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুসম্পর্ক রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, মোদী হলেন দেশের ২৯টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যাঁর সঙ্গে আবে-র যোগাযোগ ছিল ট্যুইটারে। আবে একজন পরিচিত ভারতপ্রেমী, তিনি স্মারকে ভারতের প্রশংসা করে লিখেছেন 'A beautiful Country' এবং তিনি একজন জাপানি প্রধানমন্ত্রী যিনি ইন্দো-জাপানি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতকে ভবিষ্যৎ ইন্দো-জাপান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের যোগসূত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মোদী জাপানকে এক শক্তিমান ব্যক্তিগত বন্ধু বলে মনে করেন। কারণ তাঁর গুরু এবং আদর্শ পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে যখন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যান সেই পরিভ্রমণের সময়ে জাপানে এক ঝটিকা সফর করেন। আর সেখানে জাপানিদের অভূতপূর্ব অভিনন্দনের প্রেক্ষিতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জাপান একদিন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি হবে যাকে কেউ দমাতে পারবে না।

জাপান-ভারত সম্পর্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে পারস্পরিক সম্মান এবং সহযোগিতার ওপর। জাপান ভারতের চতুর্থ বড় পুঁজি নিবেশক দেশ, যে দেশ এদেশে বিভিন্ন

প্রকল্পে ১৪ বিলিয়ন ডলার মূলধন জুগিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ২০১২ সালে বাণিজ্য হয়েছে ১৮ বিলিয়ন ডলার। মোদী-আবে সখ্যতায় সেই বাণিজ্য আরও প্রসারিত হবে বলে আশা। মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই বিভিন্ন শিল্পে ও পরিকাঠামোয় ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার পুঁজি নিবেশ করেছে ভাইব্রান্ট গুজরাট গড়তে। প্রধানমন্ত্রী হবার পর মোদী দিল্লী মেট্রোরেল কর্পোরেশন-কে এক 'নিদর্শন' হিসেবে দেখাতে চাইছেন দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে আরও বেশি সফল করার দিশায়।

দুই দেশের সহযোগিতায় তালিকার শীর্ষে যে সব প্রকল্প রয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে স্বপ্নিল দিল্লী-মুম্বাই শিল্প করিডর, দিল্লী- আমেদাবাদ-মুম্বাই বুলেট ট্রেন প্রকল্প। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র এখনও খোলা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারত-জাপান যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারে প্রতিরক্ষা শিল্প। দুই দেশই জাহাজ শিল্পের সহযোগী। ভবিষ্যতে জোর দেওয়া হবে প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যিক জাহাজ গড়ার ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রাধান্য রয়েছে কম্যুনিস্ট চীনের।

সমুদ্র উপকূলবর্তী দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন, কারণ দুই দেশই শক্তি (energy) আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ভারত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের যোগাযোগের ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা প্রয়োজন কারণ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল রয়েছে দক্ষিণ-চীন সমুদ্রে।

দুই দেশই ২০০৬ সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তিতে এবং ২০09 সালে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। নতুন প্রতিরক্ষা নীতিতে রয়েছে শান্তিবার্তা যা জাপ প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা প্রসূত। এটা তিনি শুরু করেছেন ২০১৩-র শেষভাগে এবং এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে প্রতিরক্ষা এবং সামরিক চুক্তি যা নতুন করে স্বাক্ষরিত হবে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে।

এই অঞ্চলে তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী চীন চাইছে অরুণাচল এবং জাপানের সেনকাফু দ্বীপপুঞ্জের দখলদারি এবং সেখানে তারা ক্রমাগত বাড়াচ্ছে সামরিক তৎপরতা। নতুন করে চীন চাইছে এই অঞ্চলগুলি তাদের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে। তাই অরুণাচলপ্রদেশে ভারতকে গড়ে তুলতে হচ্ছে সামরিক পরিকাঠামো এবং মার্কিন-ভারত-জাপান এই তিন দেশের নৌ-টহলদারি চলছে এই সামুদ্রিক করিডরে চীনের শক্তিকে খর্ব করতে।

এই পরিস্থিতিতে মোদী এবং আবের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। এতদিন দুই দেশেই জোট সরকার চলছিল, কারণ দুই দেশে কোনো দলই এতদিন নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পায়নি। কিন্তু বর্তমানে দুই দেশেরই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। ২০১২-তে আবে ক্ষমতাশীল হয়েছেন বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে। আবার ২০১৪-তে গেরুয়া ঝড় তুলে মোদী ক্ষমতায় বসেছেন। উভয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গড়েছেন, ফলে দুই দেশেই শেষ হয়েছে জোট সরকারের যুগ, যে সরকারগুলি নীতিপঙ্গুত্বে এবং অস্থায়িত্বের আশঙ্কায় ভুগছিল। দু'জনেই জাতীয়তাবাদী এবং দু'জনেরই নিজস্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং তা অত্যন্ত সুবিদিত--- মোদীনমিক্স এবং আবেনমিক্স। আমেরিকা ২০05 সালে মোদীকে ভিসা দেয়নি ২০০২-র গুজরাট দাঙ্গার জন্য। অন্যত্র চীন আবেকে চীন দর্শনের অনুমতি দেয়নি, কারণ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীনের মাটিতে নিহত যোদ্ধাদের সম্মান জানিয়েছেন আর তাদের ভস্ম জাপানের 'বিতর্কিত' বৌদ্ধ মন্দিরে সুরক্ষিত রাখার অপরাধে। দুই নেতারই বিগত শতকের চারের দশকের পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জন্ম। দু'জনেই পুস্তক-প্রিয়, দু'জনেই কলমচি এবং দুজনেই ফ্যাশন দুরস্ত ও ভোজনরসিক।

এবার যদি মোদী জাপান সফরে যান তবে তা হবে আবের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় সাক্ষাৎ। এর আগে ২০০৭-এ আবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যখন আবে ভারত সফরে আসেন। দ্বিতীয় সাক্ষাৎটি হয় ২০১২ সালে যখন মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীরূপে জাপান সফরে যান। তখন তাঁকে এমন উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় যেন আবে ধরে নিয়েছিলেন যে, ২০১৪ সালে মোদী ক্ষমতাসীন হবেন।

নতুন করে দু'দেশের সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠায় উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে দুই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন দেশের। একজন প্রসিদ্ধ চিন্তক যিনি দুই দেশের সামরিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি মোদীকে চিহ্নিত করেছেন 'ভারতের আবে' হিসেবে এবং আবেকে 'জাপানের মোদী' রূপে। কিন্তু আবে-বিরোধী এবং ভারত শত্রু চৈনিক নেতৃত্ব মোদীকে 'ভারতের নিক্সন' হিসেবে চিহ্নিত করছে। অথচ ১৯৭১ সালে নিক্সনের চীন সফরের পর দুই দেশের সম্পর্কের শীতলতা কেটেছে।

কম্যুনিস্ট চীন ও জাপান সম্পর্ক মধুর নয়। মোদীকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে কৌশল নিতে হবে দুই বিবাদমান এশিয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে। সেই সঙ্গে আবে-ময় জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ভারতে মোদী যুগের পত্তন প্রস্ফুটিত 'কমলের' মাধ্যমে। ইন্দো- জাপান সম্পর্ক আরও গভীর হবে তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই মিলেছে। ইন্দো-জাপান সম্পর্কের নয়া যুগ আসছে। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের অসাধ্য-সাধন

কীটনাশকের অভিশাপ থেকে মুক্তির দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশনের একটি সাম্প্রতিকতম সমীক্ষা বলছে যে আমরা আমাদের রান্নাঘরে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত শাক-সবজি প্রবেশ করাই, তার সঙ্গেই অনুপ্রবেশ করে প্রায় গোটা আঠেরো কীটনাশক। এর মধ্যে অন্তত পাঁচটি কীটনাশক থাকে সব সবজিতেই। নিষিদ্ধ কীটনাশক যেমন অলডিকার্ব এবং তীব্র বিষক্রিয়াযুক্ত কীটনাশক মনোক্রোটো-ফোসের মতো মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক পদার্থও থাকছে। এই তথ্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারি সংস্থার প্রতিবেদনেও একই তথ্য উঠে এসেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের নিজস্ব সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছিল বিভিন্ন শাক-সবজিতে কী ভয়ঙ্কর সব কীটনাশক থাকে। যেমন— ঢ্যাড়শে ও বাঁধাকপিতে কাইপারমেথ্রিন, ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে ক্লোরপাইরিফস ইত্যাদি।

ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ২০০৩ সালে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিল তাদের সংগৃহীত শাক-সবজির সমস্ত নমুনাতেই কীটনাশকের বিপুল পরিমাণ উপস্থিতি। এরপর ২০১০ সালেও তারা যে সমীক্ষা চালায় তাতেও ওই ফলাফলের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। দিল্লীতেও একই ধরনের সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে ৩৫ ধরনের শাক-সবজি ও ফলমূলের নমুনায় নিষিদ্ধ কীটনাশকের বিশাল উপস্থিতি।

উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বড়জোর ১ শতাংশ কীটনাশক পতঙ্গ-পোকামাকড়ের ওপর কাজ করে থাকে। এবং বাকি ৯৯ শতাংশ খাবার, জল কিংবা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দেহের ভেতর প্রবেশ করে, যা একটি মানবশরীরের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক। যে কারণে মাতৃদুগ্ধও সংক্রমিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। আই আই টি কানপুরের গবেষিকা ড. রেশমি সাঙ্গি গবেষণা করে দেখেছেন মাতৃদুগ্ধের নমুনায় কীটনাশকের উপস্থিতি নির্ধারিত সীমার থেকে আটশো শতাংশ ছাড়িয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা এন্ডোসুলফানের মতো অতি-ভয়ঙ্কর কীটনাশকের উপস্থিতিও এতে ধরা পড়েছে। কেরলের কাসারগঞ্জ এলাকায় অন্তত হাজার পাঁচেক মানুষের জীবন নিয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে পঙ্গু করে দিয়েছে এই এন্ডোসুলফান। গবেষণায় দেখা গিয়েছে খাদ্য, জল কিংবা বাতাসের মধ্যে দিয়ে এই মারণ-কীটনাশকটি আমাদের দেহে প্রবেশ করছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য ও নারী কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল ড. সন্ধ্যা কুলশরেস্থার নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। শাক-সবজি ও ফলমূলে মারণ-কীটনাশকের উপস্থিতি কীভাবে রোধ করা যেতে পারে তা নিয়ে ২০১৩-র মার্চে বিশেষজ্ঞ কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে পরিবেশ-বান্ধব বায়োকীটনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

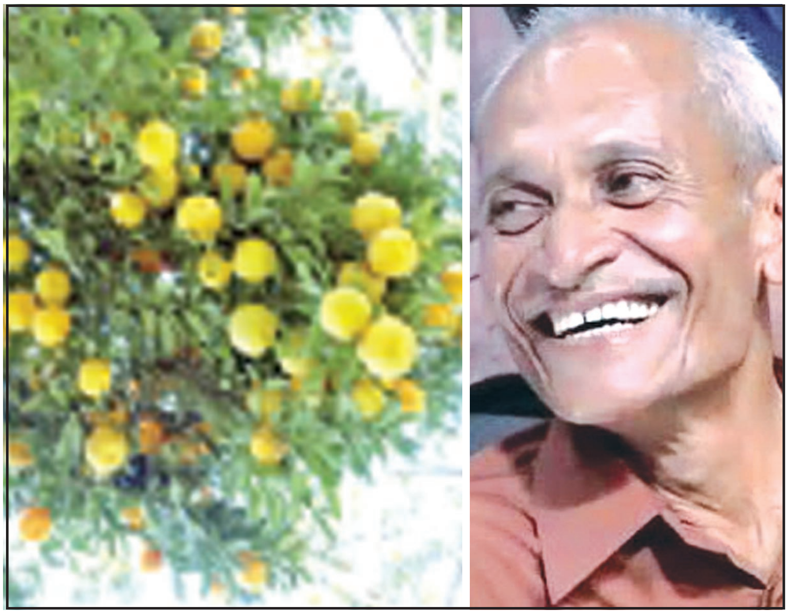

হুকুমচাঁদ পাতিদার ও তাঁর বাগনের ফল।

কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির দায় কে নেবে আর কে-ই বা 'পরিবেশ বান্ধব বায়োকীটনাশক' ব্যবহারে রাজি হবে? বাস্তব সত্য হলো সরকার কিংবা কৃষক কারুরই রাসায়নিক কীটনাশক বর্জনে এবং প্রকৃতি বন্ধু কৃষিকর্ম গ্রহণে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। রাজস্থানে

মানপুরা বলে একটা গ্রাম আছে। আসনাওয়ার তহসিলের অন্তর্গত এই গ্রামটি জালাওয়ার জেলাকেন্দ্র থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কৃষিপ্রধান গ্রামটির বাসিন্দা ৩৫৫ জন মানুষ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা আর রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করবেন না এবং অধিকাংশ কৃষকই জৈব-কৃষিকাজের দিকে ঝোঁকেন। সাধারণভাবে এমন একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে রাসায়নিক কৃষিকাজে জৈব-কৃষিকাজের চেয়ে ফলন বেশি হয়। কিন্তু মানপুরার গ্রামবাসীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন জৈব কৃষিকাজেই ফলন বেশি, রাসায়নিক কৃষিকাজের চেয়ে। উপরন্তু পরিবেশটাও বাঁচে। গ্রামবাসীদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের নেপথ্যের কারিগর যিনি তাঁর নাম হুকুমচাঁদ পাতিদার। এই ব্যক্তিটিই ২০০৩ সালে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং আজ একদশক পরে শুধু গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাই নয়, গোটা এলাকার জীব-বৈচিত্র্যই পাল্টে দিয়েছেন।

গ্রামটিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিত্য শাখা চলে। গ্রামের সিংহভাগ বাসিন্দাই স্বয়ংসেবক। তাঁরা একবাক্যে এহেন প্রকল্পের জন্য হস্তিমলজীর অবিসংবাদিত ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, শ্রী হস্তিমল বর্তমানে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনিই মানপুরাকে 'আদর্শ গ্রাম' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। আর এই পরিকল্পনার প্রথমদিন থেকেই গ্রামবাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে দেন। পরিবর্তে গো-ভিত্তিক ও প্রকৃতি-বান্ধব কীটনাশক ব্যবহার করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যেই গ্রামটিতে ঘুরে গিয়েছেন বরিষ্ঠ সঙ্ঘ-আধিকারীকরা। যেমন--- সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, অখিল ভারতীয় গ্রাম বিকাশ প্রমুখ ড. দীনেশজী, অখিল ভারতীয় গো-সেবা প্রমুখ শ্রী শঙ্করলাল প্রমুখ।

আসলে এই প্রকল্পের মূল মস্তিষ্ক পাতিদারের খামারে ২০০৩ সালে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। অনেক ময়ূর ও আরও কিছু পশুপাখি মারা যেতে শুরু করে তাঁর খামারে। তিনি অনুসন্ধান করে দেখতে পান কীটনাশকের প্রভাবেই বিষক্রিয়া হয়ে মৃত্যু হচ্ছে পশুপাখির। তিনি নিজেই মনোক্রোটোফস এবং এন্ডোসুলফানের মতো কীটনাশক ব্যবহার করতেন। এর মধ্যে প্রথমোক্ত কীটনাশকটি পাখীদের পক্ষে রীতিমতো বিপজ্জনক। এর ফলে তাঁর মনে এক ধরনের অপরাধবোধ জাগে এবং তাঁর কাজের গতিপথই পাল্টে যায়। ২০০৩-এ তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন এখন তা ছড়িয়ে গিয়েছে মানপুরার সব কৃষকের মধ্যে।

প্রায় দু'শো একর জুড়ে ডাল, গম, দানাশস্য, শাক-সবজি এবং বিভিন্ন ফল-মূল যেমন--- পেঁপে, কমলালেবু আর মশলাপাতি যেমন— ধনে, রসুন ও মেথির চাষ সেখানে খুব জনপ্রিয়। আর এই উৎপাদনের চাহিদা ভারত ছাড়িয়ে জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও কোরিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি খবর আগামী ১৯-২০ জুলাই জাপান থেকে একদল কৃষি-গবেষক এই জৈব-প্রযুক্তিতে বিপুল ফলনের রহস্য জানতে মানপুরা গ্রামে পদার্পণ করতে চলেছেন।

এই রাজ্যের মানুষ শুনে খুশি হবেন যে মানপুরা গ্রামে জৈব উৎপাদনের চাহিদা রাজস্থানের জয়পুর, উদয়পুর, কোটা, জালওয়ার ইত্যাদির সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা এমনই যে ফলনের আগেই অর্ডার চলে আসছে। পাতিদারকে গত বছর তাঁর 'সত্যমেব জয়তে' প্রদর্শনের একটি এপিসোডে ডেকে ছিলেন চলচ্চিত্রাভিনেতা আমির খান, সারা দেশের মানুষের সঙ্গে পাতিদারের অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে। হুকুমচাঁদ পাতিদার সেখানে নিজের অভিজ্ঞতায় বলেন : 'জৈব কৃষিকার্যে ফলন কমার কোনও প্রশ্ন নেই। ২০০৩-এ যখন শুরু করি, তারপর থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ফলন একটু কম হোত ঠিকই কিন্তু তারপরের বছর থেকেই ক্রমাগত উৎপাদন হার বাড়তে থাকে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।' আশপাশেও জৈব-কৃষিকে ছড়িয়ে দিতে মানপুরাবাসী গঠন করেছেন 'অক্ষয় জৈবিক কৃষি সংস্থান।' এর সঙ্গে যুক্ত ১২০ জন কৃষক। গোটা রাজস্থান জুড়েই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে এঁদের কার্যকলাপ। যা ইতিমধ্যেই বারমের, বিকানীর সমেত অন্যান্য সাতটি জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে।

অধিকাংশ মানুষের কাছেই গোরু ও বাছুর কোনো কাজের নয় বলে গণ্য হয়। কিন্তু মানপুরাবাসীরা প্রমাণ করে ছেড়েছেন গোরু ও বাছুরই এই পরিবর্তনের প্রধান কাণ্ডারি। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে দেশি গোরু। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় গো-সেবা প্রমুখ শঙ্করলালজী জানিয়েছেন : 'বিজ্ঞানসম্মতভাবেই এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত-জাত গোরুর এই দেশকে রোগমুক্ত, ঋণমুক্ত, দূষণমুক্ত, অপরাধমুক্ত, বেকারত্বমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত এবং অপুষ্টিমুক্ত করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পুরো সত্যটা না জানার জন্যই অনেকে এগোতে চান না।

মানপুরার স্বয়ংসেবকরা একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।'

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বাংশে জৈব-কৃষিকাজের অনেক সফল উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে ইতিপূর্বে, কিন্তু মানপুরার এই গবেষণার সাফল্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটালো। কারণ তাঁদের সাফল্য খুব দেরি করে ফেলার আগে উত্তর ভারতের মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিল।

সাফল্যের মূলমন্ত্র :

(১) সম্পূর্ণ গো-ভিত্তিক কৃষিকাজের সফল প্রকল্প।

(২) এই পরিবর্তনের নেপথ্যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

(৩) ২০০৩-এ মাত্র একজন কৃষককে দিয়ে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আজ তার সহযোগী গোটা মানপুরা গ্রাম।

(৪) জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও কোরিয়ায় এই জৈব- উৎপাদনের আজ বিপুল চাহিদা।

(সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

সাক্ষাৎকার

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আদেশ নারী-বিদ্বেষী মোল্লাদের অশনি সঙ্কেত

নূরজাহান সফিয়া নিয়াঝ

ভারতীয় মুসলমান মহিলা আন্দোলন (বি এম এম এ) নামের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি সম্প্রতি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের কাছে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের আশু বিধিবদ্ধকরণের (codification) করার সুপারিশ করেছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই প্রস্তাবিত Muslim Marriage & Divorce Act কার্যকর হলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে বিস্ফোরক পরিবর্তন ঘটে যাবে। প্রস্তাবিত এই আইনে সম্পূর্ণ বেআইনি হয়ে যাবে— (১) বহু বিবাহ, (২) মুখের কথায় সম্পূর্ণ একপক্ষীয় (স্বামীর) খেয়ালখুশিতে দেওয়া তালাকপ্রসূত বিবাহবিচ্ছেদ নিষিদ্ধ হবে। (৩) মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি বিবাহ বাধ্যতামূলক ভাবে নথিবদ্ধ করতে হবে।

উল্লেখিত বি এম এম এ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নূরজাহান সফিয়া নিয়াঝ সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সদ্য ফতোয়া জারি করা বা সমান্তরাল আইন ব্যবস্থা চালানোর ওপর তীব্র ক্ষোভ ও লাগাম পরানোর চেষ্টা থেকে মৌলবাদীদের তীব্র বাধাদান পর্বগুলির উল্লেখ করেছেন।

▯ **আচ্ছা, আপনার তৈরি মুসলমান আইনে বিবিবদ্ধকরণের খসড়াটি মুসলমান ব্যক্তিগত আইনের থেকে কেমনভাবে আলাদা?**

▯ ভারতে বলবৎ থাকা শরিয়ত আইনের তিনটি ধারা— (১) শরিয়ত অ্যাপলিকেশন অ্যাক্ট-১৯৩৭, (২) মুসলমান মহিলাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া সংশ্লিষ্ট ধারা-১৯৩৯, (৩) মুসলমান মহিলাদের (বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা সংক্রান্ত) ধারা-১৯৮৬। এই তিনটি ধারাই মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক। এই আইনে বলা হয়েছে মুসলমানরা শরিয়তি আইনের আওতায় থাকবে। মুসলমান মহিলারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে এখানে। অথচ একজন বিবাহিত পুরুষ কোন পদ্ধতিতে কি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইবে তার কোনো নির্দেশনামা নেই। এরই ফলে সুবিধাজনকভাবে পুরুষেরা ধরে নেয় তাদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিচ্ছেদ পদ্ধতি নেই। ফলে নিজের মতো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা আজও কেবল তালাক বা বিচ্ছেদ উচ্চারণ করেই বা টেলিফোনের মাধ্যমে, আজকাল অনেক সময় এসএমএস করে বা ই-মেল করেই বিবাহ বিচ্ছেদ চালু করে দিচ্ছে।

প্রস্তাবিত আইনে এই ধরনের বিচ্ছেদ অবৈধ হয়ে যাবে। আমাদের প্রস্তাবিত বিধিবদ্ধকরণের ফলে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স ২১ ও ১৮ হতেই হবে এবং বিয়ের নথিবদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য বিয়ে নথিভুক্তির সময়েই জানাতে হবে উভয়েরই কোনো জীবিত স্ত্রী বা স্বামী নেই। স্বাভাবিকভাবেই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে বহুবিবাহ।

▯ **আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী পুরুষ প্রাধান্যময় মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (AIMPLB) তো এর তীব্র বিরোধিতা করবে। সে চ্যালেঞ্জ কি আপনি নিতে পারবেন?**

▯ দেখুন, মুখোমুখি আলোচনার সময় আমাদের সংগঠনের অনেক পুরুষ সদস্যই

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বহুবিবাহ সম্পূর্ণ লোপ করার বিষয়ে তাদের অসন্তোষ জানিয়েছিল। কিন্তু সারা দেশের মহিলা প্রতিবাদীরা এক জোট হয়ে জানায় বহুবিবাহ মুসলমান পুরুষদের মেয়েদের লাঞ্ছনা করার একটি সেরা অস্ত্র।

অন্য স্ত্রীর ভয়ের খাঁড়া দেখিয়েই তারা তাদের শাসন চালায়। এর শেষ হওয়া দরকার। অথচ দেখুন কোরানে কিন্তু পরিষ্কার উল্লেখ আছে এক বিবাহই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, কেননা একজন পুরুষের পক্ষে তার বহু স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব (কথাটি বিবাহিত জীবনের সব প্রধান ক্ষেত্রগুলিতেই প্রযোজ্য)।

হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই জানি যে রক্ষণশীল মোল্লারা মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড (AIMPLB)-এ বসে আছে। তাঁরা সহজে মুসলমান আইনে আমাদের প্রস্তাবিত বিধিবদ্ধকরণগুলি মেনে নেবে না। কিন্তু আমরা হাল ছাড়ব না। আমাদের গৃহীত বিধিবদ্ধকরণের প্রস্তাবগুলি আমরা আইন মন্ত্রণালয়, মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো প্রতিটি আইনসিদ্ধ সংস্থার কাছে পাঠাচ্ছি। আমরা চাই জাতীয় জীবনে বিতর্ক হোক। আসুক নানান অভিমত।

▢ আচ্ছা, সুপ্রিম কোর্টের শরিয়তি আইনকে দেশের মধ্যে সমান্তরাল আইনব্যস্থা চালানোর দায়ে অভিযুক্ত করা বা ফতোয়া জারি করাকে অবৈধ ঘোষণা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনি কীভাবে দেখছেন?

▢ আমরা অবশ্যই সর্বোচ্চ আদালতের এই বিচারকে স্বাগত জানাচ্ছি। অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আদালত শরিয়তি আইনের ওপর লাগাম দিতে চেয়েছে। এই আইনে অধিকাংশ সময়ই সংবিধানের দেওয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করা হয়।

আরও একটা বিষয়, এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত গরিব মুসলমান মেয়েরা দ্রুত ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা দেখছে। অন্যদিকে গরিষ্ঠাংশ নারী বিদ্বেষী মোল্লারাও খেয়ালখুশি মতো ফতোয়া দেওয়ার আগে দু'বার ভাববে।

এ প্রসঙ্গে বলি শরিয়তি আদালতের সেই সমস্ত রায়ই দেওয়া উচিত যেগুলি গৃহীত ন্যায় ও নীতির উপর চিরকালীনভাবে প্রতিষ্ঠিত বা তার সঙ্গে সাযুজ্য আছে এমন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুপ্রিম কোর্টের আদেশের ফলে মুসলমান পার্সোনাল ল' বোর্ডে-এ আমাদের প্রস্তাবগুলির বিধিবদ্ধকরণ (Codification) অচিরেই ঘটবে যাতে হতভাগ্য ইমরানার মতো লাঞ্ছনা আর কোনো মুসলমান মেয়ের ভাগ্যে না ঘটে। মনে করুন, ইমরানার ক্ষেত্রে কত বড় অবিচারটাই না ঘটে গেছে। নিজের পশুসমতুল শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার ফলে শরিয়তি আদালত তার স্বামীর সঙ্গে বিয়েটাই নাকচ করে দেয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে! ■

‘ডা: হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান’

পরিচালনায় : শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়

দিনাঙ্ক : ১৫ আগস্ট, ২০১৪, সময় : সকাল ১০ ঘটিকা

স্থান : ওসোয়াল ভবন, কলকাতা

সম্মান প্রাপক : অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্তল (অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ)

প্রধান বক্তা : ড. কৃষ্ণগোপাল (সহ-সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)

একজন শিক্ষকের প্রেরণাতে আদর্শ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রে জলগাঁও জেলার মুক্তাইনগর তহসিলের কাকোড়া গ্রাম ভারতের অধিকাংশ গ্রামের মতোই নানান সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ১৯৭৭ সালে গ্রামেরই এক শিক্ষক ভালচন্দ্র দিনকর কুলকার্ণী গ্রাম বিকাশের কাজ শুরু করেন। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে। আজ গ্রামটি একটি 'আদর্শগ্রাম' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

গ্রামে অধিকাংশ মানুষই কৃষক ও খেতমজুত। কৃষিকাজ বর্ষার জলের ওপর নির্ভর থাকায় বেশির ভাগ মানুষের ছ'মাস হাতে কোনো কাজ থাকতো না। কাজ না থাকার দরুন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হোত। গ্রামের পরিবেশও খুব খারাপ ছিল। গ্রামে পানীয় জল প্রায়ই পাওয়া যেত না। গ্রীষ্মকালে অনেক দূর থেকে পানীয় দল আনতে হোত। গ্রামে রাস্তাঘাটও ছিল না। কেবলমাত্র দু'একজনের বাড়িতেই বিদ্যুতের আলো ছিল। কোনোরকম ভাবে মানুষ বেঁচে থাকতো।

ভালচন্দ্র কুলকার্ণী

গ্রাম পরিষ্কার করছেন স্থানীয় মানুষ।

শিক্ষক ভালচন্দ্রের এজন্য খুবই মনোকষ্ট ছিল। তিনি গ্রামের ছেলেমেয়েদের খুব ভালোভাবে পড়াতে শুরু করেন। কয়েকবছর পর তিনি গ্রামের যুবক-যুবতীকে নিয়ে গ্রামবিকাশ সমিতি তৈরি করেন। প্রথমেই গ্রামের সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশুনা করে তার ওপর জোর দেন। সেজন্য সমিতির পক্ষ থেকে পাঠদান কেন্দ্র শুরু করেন। প্রথম যেদিন তিনি পাঠদান কেন্দ্র শুরু করেছিলেন তখন মাত্র পাঁচজন বিদ্যার্থী পড়তে আসতো। আর এখন সংখ্যা এত বেড়েছে যে চারজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া হচ্ছে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা ভেবে গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি দল তৈরি করেছেন। তাতে পুরুষ-মহিলা দুই আছেন। তাঁরা সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখেন কোথাও নোংরা-আবর্জনা জমেছে কীনা। এর ফলে দশ বছর আগেই কাকোড়া গ্রাম নির্মল গ্রামের তকমা পেয়েছে। এখন গ্রামে সুন্দর রাস্তা, ভালো নিকাশী ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে শৌচাগার। গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকারি ভাবেও নানান অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামে এখন একটি 'আরোগ্য পেটী' অর্থাৎ হেলথ কিট যোজনা চলছে।

গ্রাম বিকাশ সমিতি গ্রামে সর্বস্তরে লক্ষ্য রেখে কাজ করে চলেছে। এলাকার যাযাবর সমাজের জন্য গ্রামে একটি পাড়া তৈরি হয়েছে। ঘর, পানীয় জলের সুবিধা ও আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এই সমাজের শিশুদের পড়াশুনার বিষয়েও গ্রামবিকাশ সমিতি খুব সচেতন। গ্রামের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে গ্রামবিকাশ সমিতির সদস্যরা সদা তৎপর। গ্রামে প্রতিবছর বড় আকারে দুর্গাউৎসব পালন করা হয়। প্রতি বছর বৃক্ষরোপণের সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভের জলস্তর বাড়ানোর যোজনাও তৈরি করা হয়। এজন্য স্থানে স্থানে জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রামের পাশে ছোট নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। কৃষকরা উন্নত পদ্ধতিতে জৈবিক কৃষিকাজ করছেন। ভূমিহীনরা সারা বছর জমিতে কাজ করে ভালো মতো পয়সা উপার্জন করে। কৃষিকাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতি বছর কৃষিমেলার আয়োজন করা হয়।

গ্রামের মহিলাদের আর্থিক দৃষ্টিতে স্বাবলম্বী করার জন্য স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী নির্মাণ করা হয়েছে। নিজেদের কাজকর্মের পর তাঁরা এক জায়গায় এসে পাঁপড় তৈরি, সেলাই ইত্যাদি কাজে যুক্ত থাকেন। যুবকরা রোজগারের জন্য সেলুন, মুদির দোকান ও অন্য ছোটো ছোটো ব্যবসা শুরু করেছে। এজন্য তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের পরিবেশ মঙ্গলময় থাকুক— এই চিন্তা করে প্রথমদিকেই হনুমান মন্দির স্থাপন করা হয়েছে।

কাকোড়া গ্রামবাসী গ্রামের উন্নতির সবটাই ভালচন্দ্র গুরুজীকেই দিয়ে চায়। কিন্তু ভালচন্দ্র বলেন— "গ্রামবাসী আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই এসব সম্ভব হয়েছে।" তিনি একটু গর্বভরেই বলেন— "কাকোড় গ্রামকে দেখে আশেপাশের অনেক গ্রাম কাজ শুরু করে দিয়েছে। গ্রামের সবাই খুশিতে আছেন এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওনা।" ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

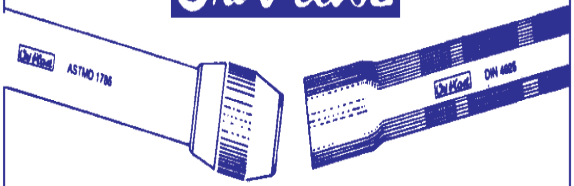

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ধর্ম হিসাবে সব কিছু গ্রহণের অপূর্ব শক্তি, সভ্যতা হিসাবে যা কিছু বিরুদ্ধ তাকে বাধা দেবার শক্তি— হিন্দুধর্ম একাধারে এই দুইটি গুণের আধার হয়ে মানব ইতিহাসের এক চরম বিরোধের সমাধান করেছে। হিন্দুধর্মকে আমরা কেবল হিন্দু রীতিনীতিগুলির রক্ষকমাত্র বলে দেখি না, দেখি 'হিন্দু-চরিত্র সৃজনকারী এক ধর্ম বলে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

সৈনিকের প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

মেজর জেনারেল কার্তিক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত গ্রন্থটিতে তাঁর দীর্ঘ সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এবং সে অভিজ্ঞতা যে সুখকর নয় তা গ্রন্থের নামকরণেই সুস্পষ্ট। লেখক সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী অনিন্দ্যসুন্দর ভাষায় পরিবেশন করেছেন। মেজর জেনারেল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে গোর্খা রাইফেলস-এ উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সৈনিক জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে চলা। বড় ভাই এবং বোনের বিয়ে উপলক্ষে লেখক দু মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন। কিন্তু বাড়ি পৌঁছোনোর ৪৮ ঘণ্টা না পেরতেই তাঁকে তাঁর ইউনিটে যোগদান করার নির্দেশ আসে। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে প্রিয় পরিজনদের মনোকষ্টে ভাসিয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হলো। মনে পড়ে ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসনের কবিতার সেই পংক্তি— 'তাদের (অর্থাৎ সৈনিকদের) জবাবদিহি করা চলবে না, তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করা চলবে না, তারা আদেশ পালন করবে এবং আত্মবলিদানের জন্য তৈরি থাকবে।'

উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদ নিয়ে লেখককে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গণে এবং ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কায় যেতে হয়েছে। পদে পদে তাঁকে জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানি আক্রমণ, পাঞ্জাবে খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের আক্রমণ, শ্রীলঙ্কায় এল টি টি জঙ্গিদের আক্রমণ, মণিপুরে নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণ তাঁকে ও তাঁর সেনাবাহিনীকে পদে পদে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। লেখক অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত লিখেছেন সৈনিকদের মধ্যে একাত্মতা, সহমর্মিতার অভিজ্ঞতা। অফিসার ও নিম্নস্তরের জওয়ানদের মধ্যে কোনো ভেদরেখা নেই, সকলে সকলের জন্য উদ্বিগ্ন। সেনা অফিসারদের স্ত্রীদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁরা সেবাকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নেন, মৃত সৈনিকদের পরিবারদের সান্ত্বনা দেন, শহিদরা যাতে প্রাপ্য অর্থ যথাযথ ভাবে পান তার জন্য তাঁরা অতন্দ্র চেষ্টা চালিয়ে যান।

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনীমালায় একটি বিশেষ দিক ধরা পড়েছে, সেটি হলো তাঁর সেবাপরায়ণতা। জঙ্গিদের যেমন তিনি

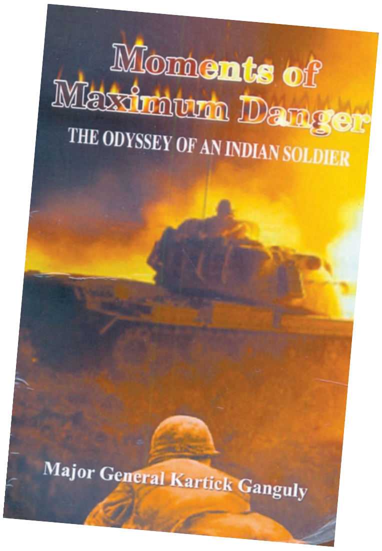

সসৈন্যে মোকাবিলা করে দুর্বল করেছেন তেমনি তিনি জঙ্গিদের তাদের স্বজাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। হাসপাতাল তৈরি করে, খেলার মাঠ তৈরি করে এবং আরো নানা ভাবে তিনি স্থানীয়দের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা তাঁদের জঙ্গি দমন করার প্রধান উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করেছে। এখানে আমরা সৈনিকদের কর্মকাণ্ডের এক অজানা দিক জানতে পারি।

তিনি কয়েকটি পংক্তিতে সিভিলিয়ানদের ক্ষুদ্রতা চিত্রিত করেছেন। তাঁরা যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথচ সেনাদের উপর খবরদারি করতে ত্রুটি করেন না। দুই আই এ এস অফিসার চেন্নাই সরকারের থেকে কিছু নির্দেশিকা বহন করে এনেছিলেন। এঁদের একজন লেখককে বলেন যুদ্ধের পরিস্থিতি কী রকম তা তাঁরা অনুভব করতে ইচ্ছুক। তিনি লেখককে জোরে ফায়ারিং করার অনুরোধ করেন। তাঁদের মাথায় আসেনি যে জঙ্গিরা এই আওয়াজ শুনলে প্রতি-আক্রমণ করবে। তাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হবে।

মোট কথা, লেখকের রচনাগুণে গ্রন্থটি একটি উচ্চমানের সামরিক সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। গোটা গ্রন্থটি উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয়। শুরু করলে ছাড়া যায় না। এমন গ্রন্থ সেনা-অফিসারেরা খুব কম রচনা করেছেন। আশা করব, মেজর জেনারেল কার্তিক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় আরো গ্রন্থ আমাদের উপহার দেবেন যা এরকমই জীবন থেকে নেওয়া।

মেজর জেনারেল কার্তিক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। মোমেন্টস অফ ম্যাক্সিমাম ডেঞ্জার : দি অডিসি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান সোলজার। প্রকাশক : স্মৃতি পাবলিসার্স, কলকাতা। মূল্য : ৪০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৬।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিভা অন্বেষণ

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা আয়োজিত নটী বিনোদিনীর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে জেলাব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, অঙ্কন বিষয়ের উপর একাধিক বিভাগে মোট ১১৮২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

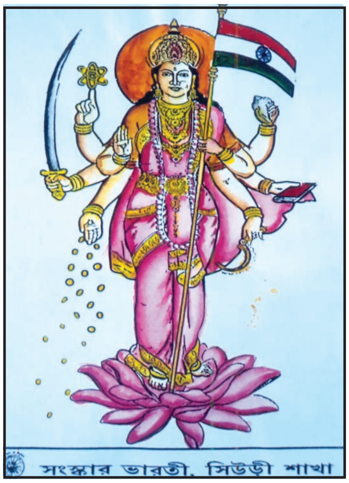

'রঙভরো' প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া অরিত্র মাহারা'র রঙকরা ভারতমাতার ছবি।

এ বছর এই প্রতিযোগিতা দশমবর্ষে পদার্পণ করল। গত ৭, ৮ জুন দুদিন ব্যাপী সিউড়ি পাইকপাড়া শিশুমন্দিরে প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সমস্ত বিচারক শহরের বাইরে থেকে এসেছিলেন। বিচারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মজা নাইডু, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নৃত্য বিভাগে বিশ্বভারতী শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক সুজিত ঘোষ, নৃত্যশিল্পী গার্গী দাস প্রমুখ। অঙ্কনের বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক অঙ্কন সম্পাদক নিমাই দাস।

সংস্থার সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, গত ১০ বছর সংস্কার ভারতীর সিউড়িশাখা সফলতার সঙ্গে বীরভূম জেলাব্যাপী এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলার নবীন শিল্পীদের প্রতিভা অন্বেষণই তাঁদের লক্ষ্য।

সফল প্রতিযোগীদের নিয়ে আগামী দিনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে তাঁরা।

ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতির আলোচনা সভা

'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভুলে থাকা শুধু অবিমৃশ্যকারিতা নয় অন্যায়ও বটে'— ঠিক এই কথাতে বক্তব্যের সুরটুকু বেঁধে দিলেন প্রখ্যাত সমাজদর্শী সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত। তার বাল্য- কৈশোরের হিরো শ্যামাপ্রসাদ সব অর্থেই দুর্ভাগা। না হলে এই বঙ্গদেশে তাকে ভুলে থাকা হয় আর সেকথা উচ্চারণ করলেই পিঠে তকমা পড়ে যায় সাম্প্রদায়িকতার। অথচ এই বঙ্গদেশে হিন্দু বাঙালি যে মাথা তুলে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে জীবন কাটাতে পারছে ৬৭ বছর ধরে, তার পিছনে রয়েছে ওই বৃষস্কন্ধ— চিরবিপ্লবী মানুষটির বোধ, বুদ্ধি ও আপোসহীন সংগ্রাম। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি যে পরিণত ও সামাজিক দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তার মূলে শ্যামাপ্রসাদ— একথা দ্ব্যর্থহীন চিত্তে স্বীকার করলেন সুখরঞ্জনবাবু।

গত ১২ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এক চিন্তাশীল, তত্ত্বদর্শী সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল বিধাননগর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক সমিতির উদ্যোগে। তাতে সামিল হয়েছিল সঙ্ঘ পরিবারের বেশ কিছু সংগঠন। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পি সি সরকার (জুনিয়র), ঐতিহাসিক প্রণব চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ গুহ, নবকুমার

সমাবেশ সমাচার

আদক, চিত্তব্রত পালিত, প্রাক্তন সাংসদ তথা আমলা বিক্রম সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ভাষণ কথকথার মধ্যে সুর-তাল- লয়ের মাত্রাও নান্দীমুখ হিসেবে সংযোজন করা হয়েছিল। তাই বাঁশি বাজিয়ে শোনান অশোক কর্মকার। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অনিতা দত্ত। আর চমৎকার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিজেপি-র সাংস্কৃতিক সেলের কর্মী ও সংগঠকরা।

বাটানগরে প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সিংহের স্মরণসভা

গত ১৩ জুলাই রবিবার বিকেলে বাটানগরে স্পোর্টস ক্লাবে প্রয়াত ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা

জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি স্মরণসভা হয়ে গেল। কৃশানু পত্রিকা, নোয়াখালি সম্মিলনীর স্থানীয় শাখা, বাটানগর নিউল্যান্ড পূজাকমিটি, রবিবাসর বজাজ সংস্থা সম্মিলিতভাবে এই স্মরণসভার আয়োজন করে। তাদের সবাইকার অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের মানুষ বিশিষ্ট লেখক এবং গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মৃতিচারণ করেন সংগ্রাম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, অনুপ কুমার আচার্য, স্বস্তিকা সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, কৃশানু পত্রিকার চঞ্চল পাল প্রমুখ। স্থানীয় বহু মানুষ এদিন এই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পুরুলিয়া শাখার গুরুবন্দন অনুষ্ঠান

গত ১৩ জুলাই রবিবার ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় রাজগড়িয়া ধর্মশালায় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে 'গুরুবন্দন কার্যক্রম' অনুষ্ঠিত হয়। মহর্ষি বেদব্যাস, দেবী সরস্বতী ও ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও দীপ প্রজ্বলন করে, সরস্বতী বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এবং আধ্যাত্মিক পৃথিবীর প্রবক্তা ও বৈদিক সভ্যতার প্রথম আচার্য মহর্ষি বেদব্যাসের মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনী ভূষণ মণ্ডল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ সঙ্ঘচালক অসিত কুমার দে এবং পুরুলিয়া চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দেশ ও সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়। পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ৪৫ জন শিক্ষক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত সকলের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করে সর্বসম্মতিক্রমে রাজ্যসভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল জেলা কমিটি ঘোষণা করেন। তিনি বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব ঘোষণা করেন নতুন প্রজন্মের দু'জন উৎসাহী তরুণ শিক্ষক যথাক্রমে পার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌম্যশঙ্খ ওঝা-র নাম।

পরাবর্তন অনুষ্ঠান

গত ৭ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে হিন্দুধর্মে পরাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নবদ্বীপ বিভাগ সম্পাদক সুজন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৪ দম্পতি এই যজ্ঞে সামিল হয়ে হিন্দুধর্মে ফিরে আসেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী এবং সুবল মহারাজ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

শুদ্ধিকরণের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সম্পাদক অনুপ মণ্ডল এবং স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ 'বর্তমান ভারতে হিন্দু সমাজের সমস্যা এবং আমাদের করণীয়' সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করেন। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মহাআনন্দে দম্পতিরা স্বগৃহে ফিরে যান।

শোকসংবাদ

মাত্র ৫৬ বছর বয়সে চলে গেলেন মালদা শহরের স্বয়ংসেবক সমীর রায়। মালদা শহরের সাভারকার শাখার মুখ্য শিক্ষক, কার্যবাহ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে শেষে জেলা ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেন। সেবা ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর হার্ডওয়ার এবং ভারত গ্যাস-এর মালিক সমীর রায় সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন উপকরণ-সহ নিজে হাজির থাকতেন।

বেশ কিছুদিন থেকে তিনি সুগারে ভুগছিলেন। সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত সমীর রায় গত ৯ জুলাই কলকাতাতে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি একপুত্র, পুত্রবধূ ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

সংশোধনী

স্বস্তিকা'র ২১ জুলাই, ২০১৪ সংখ্যার (৬৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা) ৩৭ পৃষ্ঠার 'শোকসংবাদে' প্রয়াত দেবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদের নাম কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্যুষ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর বৈঠক

গত ১৩ ও ১৪ জুন দিল্লীতে মহাশয় চুনীলাল বাল বিদ্যামন্দির (উচ্চমাধ্যমিক) পরিসরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণী বৈঠক এবং ১৫ জুন 'শাশ্বত জীবন মূল্য' বিষয়ে কর্মশালা সম্পন্ন হয়। এই বৈঠকে ২০টি রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব হয়।

পশ্চিমবাংলা থেকে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ৫ জন শিক্ষক কার্যকর্তা অংশ নেন। ২৫ এপ্রিল যন্তর মন্তর রোডে বিশাল ধর্নার মাধ্যমে ইউপিএ সরকারের কাছে যে ১৫ দফার দাবি সনদ পেশ করা হয়েছিল, সেই দাবি সনদের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এর মধ্যে কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। এই দাবির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল— সারা ভারতে একই শিক্ষানীতি ও পাঠক্রমে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষাকে স্বয়ংশাসিত সংস্থা হিসেবে ঘোষণা করা, শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত করা, সারা ভারতে একই বেতনক্রম এবং অবসর গ্রহণের বয়স সমস্ত রাজ্যে একই হওয়া। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ অনিরুদ্ধ দেশপাণ্ডে শাশ্বত জীবন মূল্যের উপর আলোকপাত করেন।

'শ্রদ্ধা'র ৫২তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৩ জুলাই সিউড়ী নগরের পশ্চিম লালকুঠিপাড়ার প্রবীণা নাগরিক আভারাণী চন্দ্রকে ৮৫ বৎসর বয়সে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিনবার 'ওঁ' ধ্বনি দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী শিবসনাতন মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মদনমোহন দাস। প্রাস্তবিক ভাষণ দেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক অরিজিৎ হাজরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন বেণীমাধব বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

পঙ্কজ আদবানী নিজেই এক প্রতিষ্ঠান

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার বৃটিশ কলোনিয়াল গেম হলেও এই খেলাটিতে বছরের পর বছর দাপট দেখিয়ে আসছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। সেই গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষ লগ্নে বিশ্ব অ্যামেচার বিলিয়ার্ডস খেতাব জিতেছিলেন উইলসন জোনস আর আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ঐতিহ্য ও কিউ স্পোর্টসের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব অনায়াসলব্ধ দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্য দায়বদ্ধতা নিয়ে বহন করে চলেছেন বেঙ্গালুরুর তিরিশ ছুঁই ছুঁই পঙ্কজ আদবানী।

গত মাসেই পঙ্কজ তার নবম বিশ্বখেতাবটি জিতেছেন। মিশরে ইন্টারন্যাশনাল বিলিয়ার্ডস অ্যান্ড স্নুকার ফেডারেশনের দ্বারা পরিচালিত সিক্স রেড বিশ্ব স্নুকার মিটে আবির্ভাবেই বাজিমাত করেছেন। আর এতদ্বারা পঙ্কজ স্নুকারের লং এবং সর্টার দু'ধরনের ফরম্যাটেই (১৫ রেড, ৬ রেড) খেতাব জিতে অনন্যসাধারণ নজির গড়েছেন। বিলিয়ার্ডসে এই কৃতিত্ব (টাইম এবং পয়েন্ট ফরম্যাট) অবশ্য আগেই অর্জন করে নিয়েছেন পঙ্কজ।

পঙ্কজ আদবানী

বেঙ্গালুরুতে বসবাস করলেও তার জন্ম কিন্তু পুনেতে। প্রাথমিক শৈশবটা অবশ্য পিতার কর্মসূত্রের দৌলতে কেটেছে কুয়েতে। এরপর বেঙ্গালুরুতে চলে আসেন পিতা। আর ফ্রাঙ্ক অ্যান্টনি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন পঙ্কজ। এই স্কুলেই তার বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের প্রতি প্রেম সঞ্চার ও হাতে খড়ি। কৈশোরে তার শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় স্নুকার চ্যাম্পিয়ন অরবিন্দ সাভুর। দু'ধরনের কিউ স্পোর্টসেই তার আগ্রহ, আজন্ম দক্ষতা অচিরেই তাকে সাভুরের প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও প্রতিভার মিশেলে কষ্টিপাথরে সিক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন পঙ্কজ। মাত্র ১২/১৩ বছর বয়সেই জাতীয় স্তরে একাধিক রেকর্ড সহ নিজেকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। ২০০০/২০০১ জাতীয় জুনিয়র বিলিয়ার্ডসে চ্যাম্পিয়ন হলেন পঙ্কজ। ২০০৩-এ জাতীয় জুনিয়র স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপে একই কৃতিত্বের সাক্ষর রাখলেন। দুই খেলাতেই সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে খেতাব জেতেন পঙ্কজ।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ ঘটান নিজের শহর বেঙ্গালুরুতে। ২০০২-এ এশিয়ান বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপে একটুর জন্য জিততে পারেননি খেতাব। তবে এত কম বয়সে ফাইনাল খেলাটাও মুখের কথা নয়। সংকল্প পূরণে বেশি সময় নেননি পঙ্কজ। পরের বছরই মাত্র ১৯ বছর বয়সে বিশ্ব স্নুকার খেতাব জেতেন চীনে। তার দু'বছর পরে মাল্টায় জেতেন বিশ্ব বিলিয়ার্ডস খেতাব। এর পরের ঘটনা অতি মাত্রিক সব সাফল্যের বিরামহীন পথ পরিক্রমা। প্রথম ভারতীয় হিসেবে বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের বিশ্ব খেতাব করায়ত্ত করেন। আর বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি কিনা আই বি এস এফ (ইন্টারন্যাশনাল বিলিয়ার্ডস অ্যান্ড স্নুকার ফেডারেশন) পরিচালিত বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের সব ফরম্যাটেই বিশ্বজয়ী হয়েছেন একাধিকবার। এর পাশাপাশি পেশাদার স্তরেও দুই কিউ স্পোর্টসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

স্নুকার ও বিলিয়ার্ডস মিলিয়ে সবশুদ্ধ ৯টি বিশ্ব খেতাবের অধিকারী পঙ্কজ। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন পাঁচবার। ২০০৬, ২০১০ পরপর দু'বার, এশিয়ান গেমসেও সোনা জিততে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। তার সঙ্গে সমসাময়িক কিউ স্পোর্টসের যারা রথী-মহারথী যেমন— স্টিভ ডেভিস, মাইক রাসেল, অ্যালান ম্যাকমানাস, ক্রেগ স্টিভম্যানদের দ্বৈরথ রূপকথার জন্ম দিয়ে যায়। এরা প্রত্যেকেই পঙ্কজের অসাধারণ ক্রীড়াদক্ষতা ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন বহুবার।

এইসব কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের জন্যই আজ স্নুকার ও বিলিয়ার্ডস প্রায় ২০/২৫টি দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েকবছর আগেও ছবিটা অন্যরকম ছিল। মূলত ভারত ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জেই আটকে ছিল খেলাটি। আজ অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডার মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশগুলি গুরুত্ব সহকারে খেলছে। আর ভারতে পঙ্কজের কীর্তিগৌরবে প্রতিদিনই কচিকাচারা বড় বড় ক্লাবে ভিড় জমাচ্ছেন খেলাটি শিখতে। এই শহর কলকাতাতেই ওয়াই এম সি এ, স্যাটারডে ক্লাব, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব-সহ বহু প্রতিষ্ঠানে বিলিয়ার্ডস, স্নুকারের চর্চা বহুলাংশে বেড়ে গেছে।

উইলসন জোন্স, মাইকেল ফেররা, গীত শেঠীর দেশে বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন পঙ্কজ আদবানী। পূর্বসূরিরা প্রত্যেকেই কিউ স্পোর্টসে জগদ্বিখ্যাত সব নাম। পঙ্কজ ভাগ্যবান। এমন একটা দেশে জন্মেছেন, যে দেশ কিউ স্পোর্টসে একপ্রকার জগদ্গুরু। অবশ্যই এইসব তারকাদের আইভরি কীর্তি এসেছে অ্যামেচার বিভাগে। প্রফেশনাল ও অ্যামেচার দুই ক্ষেত্রেই পঙ্কজের সমতুল্য কৃতিত্ব এরা দেখাতে পারেননি। কিছুটা ব্যতিক্রম অবশ্য গীত শেঠী। গীতই পঙ্কজের অনুপ্রেরণা, আদর্শ। আর সব খেলা মিলিয়ে বিশ্বনাথন আনন্দ। আনন্দও পঙ্কজের মতো তার নিজের 'ইভেন্ট' দাবায় সব ফরম্যাটে বিশ্ব সেরা হয়েছেন একাধিকবার। শুধু ফিডে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবই জিতেছেন পাঁচবার। আনন্দ অবশ্য পরিশীলিত হয়েছেন স্পেনে থেকে ও নিয়মিত ইউরোপে খেলে খেলে।

পঙ্কজ এই দেশীয় পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও দশ-বারো বছর ধরে দুনিয়াদারি করছেন। অর্জুন, পদ্মশ্রী, রাজীব গান্ধী খেলরত্ন, ইন্দো আমেরিকান ইয়ং অ্যাচিভারস পুরস্কারে ভূষিত পঙ্কজ আদবানী কোথায় গিয়ে থামবেন তা বোধহয় মহাকালই জানে।

শব্দরূপ-৭১৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

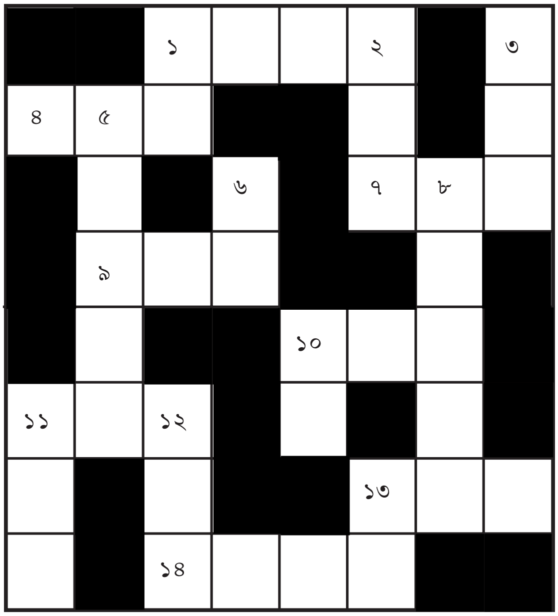

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. যে পঞ্জিকাসিদ্ধ যোগে জন্ম হলে সন্তানের মাতা বা পিতার মৃত্যু হয়, **৪.** কৃষ্ণ, শ্যামল, **৭.** ধোবা, **৯.** কুবেরের আকাশগামী রথ, **১০.** পুরাণোক্ত দ্বীপ; আজমিরের নিকট তীর্থ ও হ্রদ বিশেষ, **১১.** পৌষমাসের বনভোজন, **১৩.** 'রতনে—চেনে', **১৪.** এক চন্দ্রমাসসাধ্য ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ যাহাতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রত্যহ আহার নিয়মিত হয়।

উপর-নীচ : ১. অতীত; মৃত, **২.** 'মারি তো—, লুটি তো ভাণ্ডার' (বাগধারায়), **৩.** বিরাট রাজার শ্যালক, **৫.** যিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, **৬.** প্রেত বিশেষ, যে মাটির নীচে পোঁতা ধন আগলায়, **৮.** রাজপুত রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে আত্মোৎসর্গ, **১০.** যযাতি-শর্মিষ্ঠার পুত্র, **১১.** পুলোমার কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচী, **১২.** লম্ব আকারের পানতুয়া বিশেষ, **১৩.** যুদ্ধ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৩

দ	লু	জ		দ	শ	হ	রা
ক্ষ		বা	স	র			
	ঘো	লা		জা	ম	দা	নী
	ষ					ক্ষা	
	ব					য়	
ব্য	তী	পা	ত		বা	ণী	
			ম	র	ম		মে
মী	মা	ং	সা		ন	হু	ষ

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুব্রত সাহা
লক্ষ্মীপুর, মালদা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■ ৭১৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ আগস্ট, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ২

প্রাসঙ্গিকী

অমরনাথ যাত্রাপথে তীর্থযাত্রীদের ওপর হামলা

সংবাদদাতা॥ গত ১৮ জুলাই অমরনাথ যাত্রাপথে বালতাল আধার শিবিরে মুসলমান সম্প্রদায়ের পিট্টু ও ঘোড়াওয়ালারা তীর্থযাত্রীদের ওপর প্রচণ্ড রকমের হামলা করে। দুপুর ৩টায় হামলা করে দুষ্কৃতীরা ১৭/১৮টি লঙ্গরখানায় আগুন ধরিয়ে দেয় ৬০ জন তীর্থযাত্রীকে জখম করে। আক্রমণকারীদের হামলায় সুরক্ষা কর্মীরাও গুরুতররূপে জখম হন। তীর্থযাত্রীদের অভিযোগ, প্রতি বছর অমরনাথ যাত্রার সময় এভাবেই হামলা চালিয়ে হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করা হয়।

হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানে স্থানে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়। দিল্লীতে যন্তরমন্তরে বজরঙ্গদল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জম্মু- কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কুশপুত্তলিকা দাহ করে। অমরনাথ যাত্রী-ভক্তদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের উস্কানিতে দুষ্কৃতীরা এভাবে হামলা চালায়। বজরঙ্গদলের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রমুখ মনোজ ভার্মা জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার পদত্যাগ দাবি করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইন্দ্রপ্রস্থের সাধারণ সম্পাদক রামকৃষ্ণ শ্রীবাস্তব এই ঘটনার জন্য রাজ্যপাল-সহ স্থানীয় প্রশাসনকে দায়ী করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দিল্লীর মিডিয়া প্রমুখ বিনোদ বনসল জানান, ইতিমধ্যেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মযাত্রা মহাসঙ্ঘের পদাধিকারী মাঙ্গেরাম গর্গ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় অবগত করান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। ■

আপনার এলাকায় স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির নাম ঠিকানা

উত্তর ২৪-পরগণা

- **শঙ্কর চক্রবর্তী**
  নবনগর, হালিশহর
  ৯৮৮৩৪৮৬৬৯১
- **স্বপন কুমার সরকার**
  বেলঘড়িয়া, ব্যারাকপুর
  ৯১৬৩১৯৮৯৫০
- **সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**
  আনন্দমোহনপুর
  ৮৯০২১২৮৩১২
- **দেবু দাস**
  ব্যারাকপুর
  ৯০৩৮৫৭৪৬০১
- **সুন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**
  শ্যামনগর, ব্যারাকপুর
  ৯৮৭৪৩২০৩৪৯
- **কানাইলাল দাস**
  চন্দনপাড়া বাজার
  ৯৬৭৪১৬২০৮৮
- **সুব্রত চট্টোপাধ্যায়**
  মতুয়াধাম
  ৯৬৭৪১৬২০১১
- **সুবল দত্ত**
  দুর্গানগর
  ৯০৩৮৬৭৫৬৭১
- **তপন শীল**
  বারাসাত
  ৯১৪৩১৫৩০৬৫
- **শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়**
  নিউ ব্যারাকপুর
  ৮০১৭২১৭৯৯৪
- **সুকুমার নাথ**
  বারাসাত
  ৯৭৪৮০৯১৭৪৯
- **সুখেন্দু মণ্ডল**
  বসিরহাট
  ৯৭৩৫৭৬৩৩৭১
- **বিশ্বনাথ রায়**
  বসিরহাট
  ৯৪৭৫৩৫০৯৫২
- **নবকুমার সিংহ**
  লিহিনদা
  ৮৬৭০৩৪৯৩১২
- **প্রতাপ বিশ্বাস**
  হাসনাবাদ
  ৯৭৩৩৯০১০৯৭

দক্ষিণ ২৪-পরগণা

- **কৌশিক শাসমল**
  সোনারপুর
  ৯১৪৩০৬৯৯৯৪
- **দিলীপ মায়ারা**
  কাশীনগর
  ৯৫৪৭৭৫৫৬৬৪
- **স্বপন খটুয়া**
  ক্যানিং
  ৮৯২৬৫১২৭২১
- **উৎপল হালদার**
  শ্রীপুর, জয়নগর
  ৯৮৩০৬৭২৫২৬
- **শ্যামল কুমার দে**
  বারুইপুর
  ৯২৩১৩২৬৪৮৭
  ৯৪৩৩৫০৫৯০৯
- **সুজিত সিংহ**
  সোনারপুর, নোয়াপাড়া
  ৮৮২০৫৩৭৫৬৮
- **রাজকুমার মিস্ত্রী**
  সোনারপুর
  ৮০১৭১২৩৫৪৪
- **অজিত বসু, সনৎ বসু**
  রাজপুর
  ৯৩৩৯৯৩৯৬৩৭
- **শেখর মণ্ডল**
  সোনারপুর
  ৯১৪৩৮৭৪২৯৬
- **গৌরগোবিন্দ পট্টনায়ক**
  কাকদ্বীপ
  ৯৭৩২৭৮১৫১৯
  ৭৩৮৪২৩৭১২২
- **অলক রাজ**
  মোহনপুর
  ৯০৬২৫৬৪৯০৫
- **পূর্ণেন্দুশেখর মণ্ডল**
  ডায়মন্ডহারবার
  ৯০০২২৯১৬০৬
  ৯৬৩৫২৮০৫৯৩
- **মনোজ কুণ্ডু**
  বাটানগর
  ৯১৬৩৯৬১৭৩১
- **দীনেশ মণ্ডল**
  বজবজ
  ৯০০৭৬২৫৮২৩

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015

28 July - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা